কল্লোল

ভাগ - 3

শ্রেণি - VIII

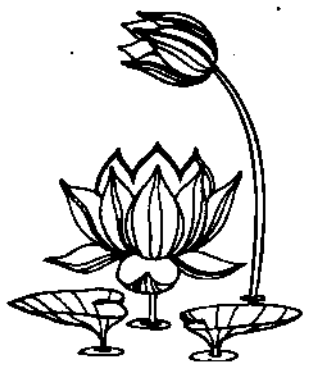

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সৌজন্যে ঃ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা ।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ ।

© বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কপোরেশন লিমিটেড

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জুলাই 2007 থেকে বিহার রাজ্যের প্রারম্ভিক শ্রেণিগুলির (I-VIII) জন্য নতুন পাঠক্রমে প্রবর্তন করা হয়েছে । ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T. কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক প্রচ্ছদ আলঙ্করণ করে মুদ্রিত করা হোল। এই বইটিকে বিহার রাজ্যের শ্রেণি অষ্টমের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত করা হয়েছে।

বিহার রাজ্য বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি-I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতিশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী পী. কে. শাহী এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলরে প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানোপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T.-র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশণ নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

প্রবন্ধ নির্দেশক,
বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লি., পাটনা

দিক্ নির্দেশ —

শ্রী রাজেশ ভূষণ — রাজ্য পরিয়োজনা নির্দেশক, বিহার শিক্ষা পরিয়োজনা পরিষদ, পাটনা।

শ্রী হাসান ওয়ারিস — নির্দেশক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণ এবং প্রশিক্ষণা পরিষদ, বিহার, পাটনা।

ড০ আবদুল মোইন — বিভাগাধ্যক্ষ, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা।

সংযোজক —

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা।

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় — অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) বি. এন. কলেজ, পাটনা।

ড০ বীথিকা সরকার — শিক্ষক (অবসর প্রাপ্ত) পাটনা কলেজিয়েট স্কুল, পাটনা।

ড০ সাধনা রায় — অধ্যাপক (অবসর প্রাপ্ত) বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) কলেজ অব কমার্স, পাটনা।

ড০ শুভ্রা চৌধুরী — সহ শিক্ষক, রঘুনাথ প্রসাদ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, পাটনা।

গৌর দাস বর্মন — প্রধান শিক্ষক, চৌতরোয়া, পশ্চিম চম্পারণ।

শঙ্কর কুমার সরকার — সহ শিক্ষক, মধ্য বিদ্যালয়, মঝরিয়া কলোনি, বেতিয়া।

শুভলক্ষ্মী লাহিড়ী — সহ শিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা

ড০ শামা পারভীন — সহ শিক্ষক, রাজকীয় মধ্য বিদ্যালয়, পালি, বিহিটা।

প্রচ্ছদ —

শুভেন্দু বিশ্বাস

পাঠ অলঙ্করণ —

মৃণাল শীল

সমীক্ষক —

ড০ গুরুচরণ সামন্ত — অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, কলেজ অব কমার্স, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়।

ড০ কল্যাণী গুপ্ত — অধ্যাপক, পি.জি. বাংলা বিভাগ, বি. আর. এ. বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মজঃফরপুর।

প্রতিবেদন

নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে অষ্টম শ্রেণির জন্য এই সংকলনটি প্রকাশিত হলো। বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি ও লেখকদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নির্বাচিত অংশ নিয়ে এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। বর্তমান যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বাংলা গদ্য ও পদ্যের ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বুনিয়াদী ধারনা গড়ে দেওয়াই বর্তমান সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য । বাংলা ভাষার নানাধরনের রচনার মধ্যদিয়ে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটা বাঁধা ধরা সময় সীমার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হয়। এই সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশের সহায়করূপে বইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। যে ভাবধারা মতান্ধতা ও অন্য প্রকার প্রগতি বিরোধী সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় সেই জাতীয় ভাবধারা সম্বলিত লেখা এখানে পরিহার করে সংবেদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রগতিশীল রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিশুমনের অহেতুক ভীতি, শিশুমনের কল্পনা, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে সহায়ক লেখাগুলিকে চয়ন করা হয়েছে। সাধু ও চলিত ভাষায় রচিত উভয় প্রকার লেখা সংকলনে গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, শিক্ষকরা পড়াবার সময় সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি পাঠের খানিকটা অংশ পড়ার পর পাঠ্যাংশের সম্ভাবিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে । মূল পাঠের শেষে বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, যার শীর্ষক 'পাঠ বোধ।'

একটি পাঠ পড়ার পর শিক্ষার্থী কতটা গ্রহণ করল বা পরবর্তী জীবনে সেই পাঠ তার সুন্দর সুষ্ঠ জীবন গড়তে কতটা সহায়ক হবে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কোনো কোনো পাঠের শেষে 'আলোচনা করো' ও 'করতে পারো' এই দুইটি বিভাগ সংযোজিত হোল যা সম্পূর্ণরূপে লিখিত পরীক্ষা বহির্ভূত থাকবে।

'আলোচনা করো' বিভাগটি ক্লাসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সহায়ক হবে।

'করতে পারো' বিভাগটিও অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের সমাজ বা পরিবেশ সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও গঠনমূলক কাজে প্রেরিত করবে।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটিতে যথাসম্ভব পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সরল বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কম্প্যুটরে ছাপার সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষরগুলির সরল রূপ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ রূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হোল যেমন - রু - রু, রূ - রূ, গু - গু, স্তু - স্তু, ক্ত - ক্ত, ড - ড়, ঙ্গ - ঙ্গ, দ্ধ - দ্ধ, বাড়ী - বাড়ি, পাখী - পাখি, শ্রেনী - শ্রেণি, কাহিনী - কাহিনি ইত্যাদি । জেনে রেখো বিশিষ্ট লেখক ও কবিদের সংকলিত পাঠগুলিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে সেই বানানগুলির সরল রূপ পাঠ পরিচয় ও পাঠবোধ দেওয়া হোলো। শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাতে এই নতুন বানান অনুসরণ করবে।

'কী' এবং 'কি' এর সংশয় দূর করবার জন্য জেনে রাখা প্রয়োজন কোনো প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' তে হলে 'কি' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি যাবে কি ? উত্তর - 'হ্যাঁ' বা 'না'। প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর হলে 'কী' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি কী খাচ্ছ ? উত্তর - চিনেবাদাম খাচ্ছি। এই পার্থক্য বিশদভাবে নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

— 14cm —

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে বানানে সর্বত্র একরূপতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সংস্করণে যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'কল্লোল' রাখা হয়েছে। কল্লোলের আভিধানিক অর্থ শব্দকারী তরঙ্গ, মহানন্দ, কলরব। এই শ্রেনির কিশোর কিশোরীর আনন্দোচ্ছ্বাস কলরব যেন বিরামহীন তরঙ্গের মতো কূল ছাপিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এই কথা মনে রেখেই বইটির নামকরণ করা হয়েছে।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা নিরীক্ষামূলকভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক সৃজনশীল পরামর্শ আমরা অত্যন্ত আনন্দের ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব।

শিক্ষার্থীরা যাতে কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে সেইজন্য শিক্ষকদের যথারীতি যত্নবান হয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

— বীথিকা সরকার

কোথায় কি আছে

গদ্য

1. অদ্ভুত আতিথেয়তা — 3
   ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
2. নচিকেতার উপাখ্যান — 9
3. মাষ্টারমশাই — 15
   প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
4. দুঃখে যে ভেঙ্গে পড়েনি — 21
   নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
5. দাশুর কীর্তি — 26
   সুকুমার রায়
6. স্বাধীনতার সৈনিক — 31
   অচিন্ত্য কুমার মুখোপাধ্যায়
7. রাতবিরেতে — 37
   সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
8. বনপথে জ্যোৎস্নার রূপ — 44
   বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
9. জ্বলন্ত চোখ — 49
   সঙ্কর্ষণ রায়
10. নন্দলাল বোস — 56
    ডাঃ (ক্যাপ্টেন) দিলীপ কুমার সিংহ
11. বাঘবন — 61
    সুকুমার দে সরকার
12. বাংলার লোকনৃত্য — 70
    শান্তিদেব ঘোষ

কোথায় কি আছে

পদ্য

1. বঙ্গভাষা — 77
   মাইকেল মধুসূদন দত্ত — 81
2. নদী
   রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — 86
3. একটি মাণিক
   প্যারীমোহন সেনগুপ্ত — 89
4. আমার বাড়ি
   কুমুদরঞ্জন মল্লিক — 93
5. কবীর
   কালিদাস রায় — 98
6. পাশের পড়া
   আশা দেবী — 102
7. আবির্ভাব
   সুকান্ত ভট্টাচার্য — 106
8. কাক্কোকিল
   প্রণব মুখোপাধ্যায় — 110
9. মানুষের গল্প
   আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়
10. স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায় — 114
    অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

কোথায় কি আছে

'অজানাকে জানো
অচেনাকে চেনো'

1. অ্যান্টার্কটিকা অভিযান — 119
   সুদীপ্তা সেনগুপ্ত
2. অমৃত — 124
   রজনীকান্ত সেন
3. বেড়াল — 126
   জীবনানন্দ দাশ
4. আলোকিত পথের দিশারী জননী রোকেয়া — 127
   নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

গদ্য

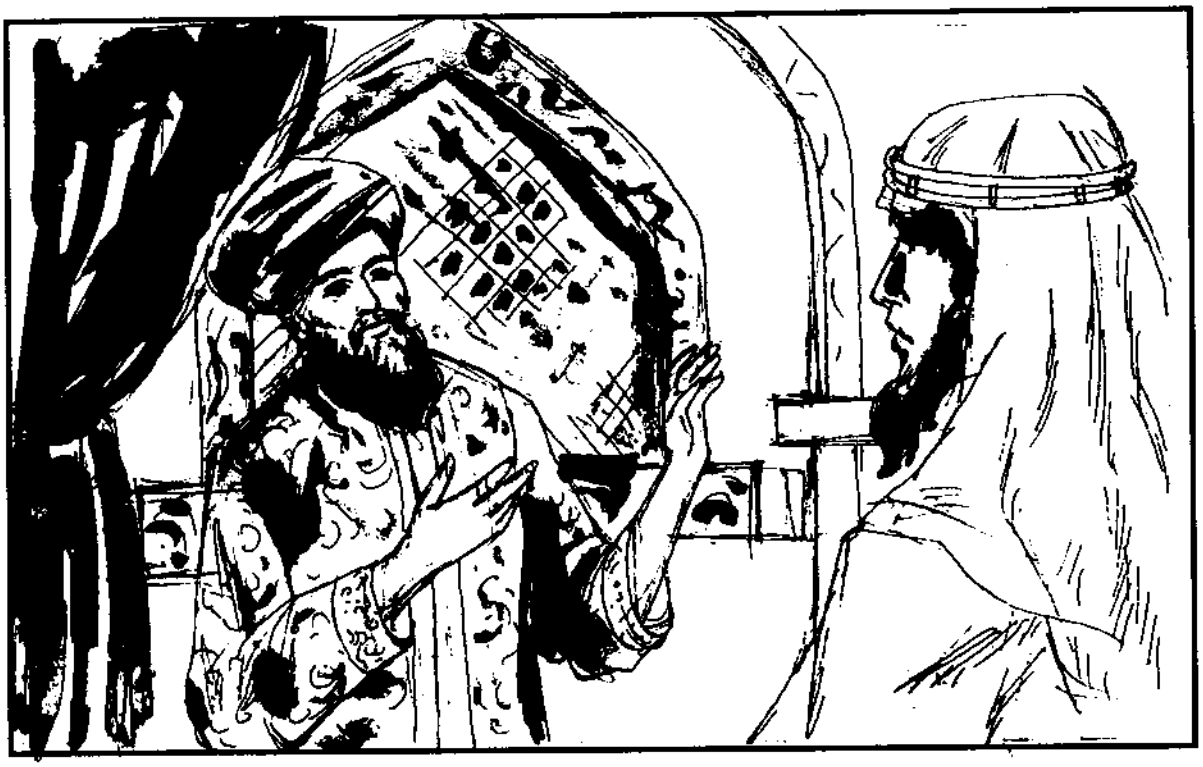

অদ্ভুত আতিথেয়তা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

একদা আরব জাতির সহিত মূরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবসেনা বহুদূর পর্যন্ত এক মূর সেনাপতির অনুসরণ করে। তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া তিনি বিপক্ষের শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, আর কোনও ক্রমেই অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি এক আরব সেনাপতির পটমন্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আশ্রয়ে উপস্থিত হইলে তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্যা করেন। সে ব্যক্তি শত্রু হইলেও অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষ প্রদর্শন বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরব সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মূর সেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি, পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তি পরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা আরব সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষনাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরেই মূর সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে,

এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া আপনকার পরিচর্যা করিতে পারিলাম না; আহার সামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে তাহাতে আপনি কোনও ক্রমেই নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যুষে এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব, সজ্জিত হইয়া পটমন্ডপের দ্বারদেশে দন্ডায়মান থাকিবেক; আমিও সেই সময় আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

১. 'তিনি বিপক্ষের শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন'।
(ক) তিনি কে? বিপক্ষের শিবির কাদের?
২. পৃথিবীর আতিথেয়তায় কোন জাতি শ্রেষ্ঠ?
৩. 'আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন।'
এই কথাটি কে বলেছে? কাকে বলেছে?

কি কারণে আরব সেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া, মূর সেনাপতি, আহার করিয়া, সন্দিহান চিত্তে শয়ন করিলেন। রজনী শেষে আরব সেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইল এবং কহিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালনাদি করুন, আহার প্রস্তুত। মূর সেনাপতি শয্যা পরিত্যাগপূর্বক, মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরব সেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না। পরে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দন্ডায়মান আছেন।

আরব সেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর, সম্ভাষণ করিয়া মূল সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন এবং কহিলেন আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। এই বিপক্ষ শিবির মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে আমরা উভয়ে একাসনে আসীন হইয়া অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র বৈরসাধন বাসনার বশবর্তী হইয়া বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্যোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধ সাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্যন্ত সূর্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই। আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও অতিথির অনিষ্ট চিন্তা করি না। কিন্তু আমার পটমন্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক এবং সেই মুহূর্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দন্ডামান আছে দেখিতেছেন, সূর্যোদয় হইবামাত্র, আমি ইহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

১. 'মুখপ্রক্ষালন' শব্দটির অর্থ কী?
২. 'আমাদের জাতীয় ধর্ম এই প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও অতিথির অনিষ্ট চিন্তা করিনা।' উক্তিটি কার? এটি কাদের জাতীয় ধর্ম?
৩. বৈরসাধন শব্দটির অর্থ কী?

এই বলিয়া, আরব সেনাপতি সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দনপূর্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরব সেনাপতিও সূর্যোদয় দর্শনমাত্র অশ্বে আরোহন করিয়া তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূর সেনাপতি কতিপয় মুহূর্তপূর্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী। এজন্য, তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশ স্থানে উপস্থিত হইলেন। আরব সেনাপতি, সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহাকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে স্বপক্ষশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধন সংকল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

জেনে রাখো

আতিথেয়তা	—	অতিথিসেবাপরায়ণতা
মূর	—	মূর জাতি মূলতঃ আফ্রিকাবাসী, বিশেষ করে মরক্কো আর আলজেরিয়ার। বলা যেতে পারে মূল শব্দটি মরক্কো শব্দ থেকে এসেছে।
সংগ্রাম	—	যুদ্ধ
বিরত	—	থামা
স্বপক্ষীয়	—	নিজপক্ষে, নিজের দিকে
শিবির	—	সেনানিবাস, ছাউনি
পরিচর্যা	—	সেবা
অণুমাত্র	—	কণামাত্র, একটুকুও
বিদ্বেষ	—	হিংসা
বিপক্ষতাচারণ	—	বিরোধিতা করা
প্রদান	—	দান করা, দেওয়া
ক্ষুৎপিপাসা	—	ক্ষুধা পিপাসা, খিদেতেষ্টা
ক্ষুন্নিবৃতি	—	ক্ষুধা নিবৃত্তি, খিদে মেটানো
পরিহার	—	ত্যাগ, ছাড়া
উপবিষ্ট	—	বসে আছে এমন, বসা
স্বীয়	—	নিজ
পরাক্রম	—	বীর্য, শক্তি
সহসা	—	হঠাৎ
বিবর্ণ	—	বর্ণহীন, ফ্যাকাসে
গাত্রোত্থান	—	গা উঠানো
কিঞ্চিৎ	—	কিছু
নিরুদ্বেগ	—	নিশ্চিন্ত, উদ্বেগ নেই
প্রত্যুষ	—	ভোর
দন্ডায়মান	—	দাঁড়ানো
সত্বর	—	তাড়াতাড়ি
প্রস্থান	—	গমন
চিত্ত	—	মন
তদ্বিষয়ে	—	সেই বিষয়ে।
আনুকূল্য	—	অনুকূল
রজনী	—	রাত্রি
সমাপন	—	শেষ
মুখরশ্মি	—	ঘোড়ার লাগাম (রশ্মি অর্থ কিরণও হয়)
শ্রবণমাত্র	—	শোনা মাত্র
আসীন	—	অবস্থিত, বসা
বৈরসাধন	—	শত্রুতা করা
প্রবৃত্ত	—	নিযুক্ত

বিলম্ব	—	দেরী
প্রানান্ত	—	প্রাণের অন্ত, প্রাণের মৃত্যু
সর্বস্বান্ত	—	নিঃশেষ
অপগত	—	শেষ হওয়া
নিমিত্ত	—	জন্য
করমর্দন	—	হাত মেলান
তদীয়	—	সেই, তার
প্রবৃ ষ্ট	—	প্রবেশ করেছে এমন
প্রতিগমন	—	ফিরে আসা

লেখক পরিচিতি

ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ - ১৮৯১) প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালায়। পিতার সঙ্গে ১৮২৮ সালে পায়ে হেঁটে কলকাতা আসার পথে মাইলস্টোন দেখে অঙ্ক শেখেন। সংস্কৃত কলেজে ১২ বছর ধরে কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি পাঠ গ্রহণ করেন। এবং তাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৩৯ সালে বিদ্যাসাগর উপাধি পান। তিনি হিন্দি ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য অধ্যাপকের পদে যোগ দিয়ে পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ হন। তাঁর দক্ষ পরিচালনার ফলে কলেজটি সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হন। বোধোদয়, বর্ণ পরিচয়, কথামালা, ঋজুপাঠ, চরিতাবলী প্রভৃতি পুস্তক তাঁর শিক্ষা বিষয়ক ভাবনার প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত। এ ছাড়াও তাঁর রঘুবংশ, সর্বদর্শন সংগ্রহ, কুমার সম্ভব, সীতার বনবাস ইত্যাদি রচনায় আধুনিক গদ্যরীতির প্রবর্তন করা হয়েছে। সমাজ সংস্কারক হিসাবে তাঁর স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। তাঁর বিধবা-বিবাহ প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করে আইন প্রবর্তন করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছয় মাসে ২০টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার জন্য নর্ম্যাল স্কুল গড়ে তোলেন। সরকারী সাহায্য বন্ধ হলে অনেক স্কুলের ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করতেন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সারাজীবন কঠোর সংগ্রামী, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীন, মানতাবাদী, জ্ঞান তপস্বী বিদ্যাসাগর সে যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অগ্রগণ্য ছিলেন।

পাঠ পরিচয়

প্রাণভয়ে ভীত, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত মূর সেনাপতি পালাতে গিয়ে ভুল করে আরব শত্রু শিবিরে উপস্থিত হন, ক্লান্ত নিরুপায় সেনাপতি শত্রু শিবিরে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আরব সেনাপতি শত্রুপক্ষ জেনেও যুদ্ধে ক্লান্ত অতিথির যথোপযুক্ত সেবা করেন। উভয়ের আলাপচারিতার মধ্যে আরব সেনাপতি তাঁর পিতৃহন্তার পরিচয় জানতে পারেন। সেই মুহূর্তে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন পরদিন সূর্যোদয়ের পর শিবিরের বাহিরে শত্রুকে বধ করবেন। পরদিন ভোর হওয়ার আগেই অতিথির নিজ শিবিরে ফিরে যাওয়ার সকল সুব্যবস্থা করে তাঁকে বিদায় জানালেন। কারণ আরববাসীরা এতটাই অতিথিপরায়ণ যে অতিথি শত্রু হলেও তার সেবাই মূল ধর্ম বলে মনে করে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আরব সেনাপতি সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করে পিতৃঘাতককে বধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু শত্রুকে তার নিজ শিবিরে প্রবেশ করতে দেখে আরব সেনাপতি ফিরে আসেন। অতিথিপরায়ণ আরববাসীর আতিথেয়তা সত্যিই অদ্ভুত। শত্রুকে কাছে পেয়েও আশ্রিত জেনে তার প্রাণনাশের কোন চেষ্টা না করে তার আত্মরক্ষার সকল সুযোগ সুবিধা করে দেয়, গল্পটির 'অদ্ভুত আতিথেয়তা নামকরণের সার্থকতাও এই খানে।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

সঠিক জায়গায় সঠিক বাক্যাংশটি বসাও

1. .....বহুদূর পর্যন্ত এক.....অনুসরণ করে

   (আরব সেনা, মূর সেনাপতির)

2. তাঁহারা পরস্পর.....সাহস, পরাক্রম.....

   প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

   (সংগ্রাম কৌশল, স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের)

সংক্ষেপে উত্তর দাও

3. 'এই বিপক্ষ শিবির মধ্যে আমা অপেক্ষা আপনার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই'

   এইটি কার উক্তি? কাকে বলা হয়েছে?

4. দুই সেনাপতির কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ সেনাপতির মুখ কেন বিবর্ণ হয়ে গেল?

বিস্তারিত উত্তর দাও

5. কথার মাঝে আরব সেনাপতি হঠাৎ উঠে গিয়ে মূর সেনাপতিকে কী বলে পাঠালেন বিস্তারিতভাবে লেখো।

6. আরব সেনাপতি মূর সেনাপতিকে সাদর সম্ভাষণ করে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে বললেন 'আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। এই বিপক্ষ শিবির মধ্যে আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই' আরব সেনাপতি কেন এই কথাগুলি বললেন? অদ্ভুত আতিথেয়তা' পাঠ অবলম্বনে বিস্তারিতভাবে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো —

বিপক্ষ	অনুপস্থিত
সবল	অপ্রস্তুত
অনাদর	অনুকূল

2. সন্ধি বিচ্ছেদ করো —

সাধ্যানুসারে	গাত্রোত্থান
যথোপযুক্ত	একাসন
প্রাণান্ত	সূর্যোদয়

3. সাধুভাষায় দেওয়া শব্দগুলি চলিত ভাষায় লেখো —

কিয়ৎক্ষণ	তৎক্ষণাৎ

অশ্বপৃষ্ঠে	মুখ প্রক্ষালন
সহসা	সমাপন
প্রস্থান	রজনী
পরিহার	শ্রবণ

4. সমাস কথাটির অর্থ হলো সংক্ষেপ। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত বা ছোট এবং সুন্দর করতে সমাসের প্রয়োজন হয়। পরস্পর অর্থযুক্ত দুই বা তার বেশি পদ যখন এক পদে পরিণত হয়, তখন তাকে সমাস বলা হয়। সমাস ছয় রকম — দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, অব্যয়ী ভাব, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ, কর্মধারয়।

যেমন — দ্বন্দ্ব -পিতা ও মাতা — পিতামাতা । দ্বিগু — নব রত্নের সমাহার—নবরত্ন। অব্যয়ীভাব - মিলের অভাব — গরমিল। বহুব্রীহি — বীণা পানিতে যার — বীণাপানি। তৎপুরুষ - জলে চলে যে — জলচর। কর্মধারয় — মহান যে রাজা — মহারাজা।

নিচে দেওয়া শব্দগুলির সমাস লেখো —

রাজারানী	উপবন
পঞ্চবটী	দশানন
স্বদেশ প্রেম	মুখচন্দ্র

নচিকেতার উপাখ্যান

চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। দেশের চারিদিক থেকে লোক ছুটে আসছে! ঋষি বাজশ্রবস যজ্ঞ করছেন। বিরাট যজ্ঞ। এ যজ্ঞে ঋষি তাঁর সব ধনসম্পদ দান করবেন।

তপোবনের একপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যজ্ঞমন্ডপ করা হয়েছে। বহু ঋষি এসেছেন, বড় বড় পন্ডিত এসেছেন। যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে; হোমানলে আহুতি দেওয়া হচ্ছে।

দানও শুরু হয়েছে। বহুবিধ দানের পর গাভীদান সুরু হল। বাজশ্রবস বহু গাভী দান করে চলেছেন।

সকলেই আনন্দে বিভোর — শুধু একটি ছেলের মুখে হাসি নেই, উৎসবের আনন্দ নেই। ম্লান গম্ভীর মুখে ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাভীদান দেখেছে। ছেলেটি বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতা। তার কিশোর মনে আজ ঝড় উঠেছে; ভাবছে "দান করা খুব ভাল কাজ। বাবা গাভী দিচ্ছেন — যাকে দিচ্ছেন তার উপকারে লাগবে বলে। সেইজন্যই তো দানের এত মহিমা; টাকা দিয়ে গরু কিনে দুধ খাবার বা ছেলেকে খাওয়াবার সামর্থ নেই যাদের, একটা গরু অমনি পেলে তাদের কত না সুবিধে হয়; কিন্তু যত খারাপ গরু ছিল, বাবা সেগুলোকেই বেছে বেছে নিয়ে এসেছেন। এমন সব রোগা জরাজীর্ণ চেহারা তাদের যে দেখলেই বিতৃষ্ণা আসে। মনে হয় এজন্মের মত ঘাস খাওয়া, জল খাওয়া তাদের শেষ হয়ে গেছে; যজ্ঞশালা থেকে ঘরে নিয়ে যাবার পথেই বোধ হয় তারা মরে যাবে, মরণের পথে পা বাড়িয়েই রয়েছে। ভাল গরু তো কত আছে; সে সব আনেননি কেন বাবা? যে উদ্দেশ্যে অপরকে গরু দান করা, সে উদ্দেশ্য কি এতে সিদ্ধ হবে? এতে তো ফল হবে উল্টো।"

অভিমানে শিশু মন ভরে উঠল। কিন্তু সে ছেলেমানুষ, এর প্রতিবাদ জানাবে কি করে? বাবার কাছে গিয়ে অভিমানভরে বলল, "বাবা, আমাকে কার কাছে দান করলেন?"

ছোট ছেলের অর্থহীন কথায় কান দেবেন, ঋষির সে সময় কোথায়? নচিকেতা কিন্তু ছাড়ল না; বারে বারে একই প্রশ্ন করে চলল। তাকে থামাবার জন্য বিরক্ত হয়ে বাজশ্রবস বললেন, "যা, তোকে যমের হাতে দিলাম।"

উত্তর শুনে চুপ করে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল

পড়ে কী বুঝলে?

১. হোমানলে কী দেওয়া হচ্ছিল ?

২. যজ্ঞে কে গাভি দান করছিলেন?

৪. "মানুষ হিসাবে আমার কি কোন মূল্যই নেই?"— একথা কে ভেবেছিল?

নচিকেতা। ভাবলো, "বাবা একি বললেন! আর এত অগ্রাহ্য করলেন আমাকে! আমি কি এতই অপদার্থ? মানুষ হিসাবে আমার কি কোন মূল্যই নেই? ভেবে দেখল,, তা সত্য নয় — "অনেকের চেয়ে আমি বড়, অনেকের তুলনায় মধ্যম; বাবার ছাত্রদের মধ্যে আমি একেবারে অধম পর্যায়ে পড়ি না।" নিজের ওপর শ্রদ্ধা জাগল, আত্মবিশ্বাসে হৃদয় ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও ঠিক হয়ে গেল। "যমরাজের অনেক কাজে লাগতে পারি," এই ভেবে সে যমরাজের কাছে যেতে কৃতসঙ্কল্প হল।

বাবার কাছে নিজ সঙ্কল্পের কথা জানাল। বাজশ্রবস শুনে আঁতকে উঠলেন অন্যমনস্ক হয়ে একটা কথাই না হয় তিনি বলে ফেলেছেন; কিন্তু তাতে কি? ছেলেকে যমলোকে পাঠানোটা কি আর পিতার অন্তরের কথা হতে পারে? নচিকেতা কিন্তু বাবাকে বোঝালেন যে, সত্যরক্ষা করা তাঁর অবশ্য-কর্তব্য। একবার যখন কথাটা বলে ফেলেছেন, তখন মনে যত কষ্টই হোক না কেন, নচিকেতাকে যমপুরীতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া তাঁর উচিত। মানুষের জীবন আর ক'দিন! যে শরীরটার মাধ্যমে পৃথিবীর রূপ-রস ভোগ করি আমরা, সেটার মৃত্যু ধ্রুব। কিন্তু সত্যরক্ষা করতে পারলে তার শুভ ফল দেহনাশের পরও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়, পর-জীবনেরও ফলদান করে।

পড়ে কি বুঝলে?

১. "যমরাজের অনেক কাজে লাগতে পারি"—একথা ভেবে কে কোথায় যাবার জন্য সঙ্কল্প করেছিল?

২. নচিকেতা পিতাকে কী বুঝিয়েছিল?

নচিকেতার কথায় হুঁশ হল বাজশ্রবসের। বাবাকে বুঝিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে নচিকেতা যমপুরীর পথে রওনা হল। যমরাজ পক্ষপাতশূন্য হয়ে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে সকলকে কর্মফল বন্টন করে দেন; ভাল কাজের ভাল ফল, খারাপ কাজের খারাপ ফল। যমরাজ নিরপেক্ষভাবে এ ব্যবস্থা করেন বলে তাঁর আর এক নাম ধর্মরাজ। কাজেই নচিকেতা যমরাজ সম্বন্ধে মনে খুব উঁচু ধারণা নিয়ে যমপুরীতে হাজির হল।

যমরাজ তখন সেখানে ছিলেন না, বাইরে গিয়েছিলেন। নচিকেতা কিছু না খেয়ে তিনদিন তাঁর ফেরার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে রইল।

তিনদিন পরে ফিরে সব দেখেশুনে যমরাজ খুব খুশী হলেন। খুব খুশী হলেন নচিকেতাকে দেখে, তার শ্রদ্ধার, তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে। বললেন, "তুমি তিনরাত্রি কষ্ট করে আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছ। এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমার কাছে তিনটি বর চেয়ে নাও।" নচিকেতা বলল, "আমি পৃথিবী ছেড়ে আপনার কাছে এসেছি। বাবা এর জন্য খুবই কষ্ট পাচ্ছেন, খুব উৎকণ্ঠা নিয়েই দিন কাটাচ্ছেন। আপনার কাছ থেকে তাঁর কাছে যখন ফিরে যাব, তখন তিনি যেন আমায় চিনতে পারেন, আর প্রসন্নমনে আমাকে গ্রহণ করেন। প্রথমে এই বরটি চাচ্ছি।"

যমরাজ বললেন, "তাই হবে, বাবা! দ্বিতীয় বর চাও।"

নচিকেতা বলল, "শুনেছি স্বর্গে গিয়ে লোক খুব সুখে থাকে। সেখানে রোগ শোক জরা নেই, মৃত্যুভয়ও নেই। যে কর্মসহায়ে সেই স্বর্গলোকে যাওয়া যায়, আমায় তা শিখিয়ে দিন।"

স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য যে যজ্ঞ করতে হয়, যমরাজ তার সব খুঁটিনাটি নচিকেতাকে শিখিয়ে দিলেন। নচিকেতা একবার শুনেই তার পুনরাবৃত্তি করল। তার মেধা দেখে প্রসন্ন হয়ে যমরাজ তাকে একটি অতিরিক্ত বর দিলেন — "নচিকেতা, তোমার নামেই এ যজ্ঞাগ্নির নামকরণ হবে।" তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার তৃতীয় বর কি চাও বল?"

নচিকেতা বলল, "কেউ বলে মৃত্যুর পরও মানুষের অস্তিত্ব থাকে; শরীরটাই নষ্ট হয়, আসল মানুষ মরে না, আত্মা অমর। আবার কেউ বলে, তা নয়, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সব কিছুর শেষ হয়ে যায়, তার আর কোন অস্তিত্বই থাকে না।

এর ভেতর কোনটা সত্য, আপনার মুখে তাই শুনতে চাই। আপনার কাছে আমি আত্মতত্ত্ব জানতে চাই।"

যমরাজ তো ছেলেটির কথা শুনে অবাক — "বলে কি ছোকরা!" তার শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস দেখে আগেই খুশী হয়েছিলেন; এখন তার ভেতর এত কম বয়সেই নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা জেগেছে দেখে মনে মনে আরও প্রসন্ন হলেন। তবু এ ইচ্ছাটা আন্তরিক কি না, তা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। নচিকেতাকে বললেন, "দেখ বাবা, এ তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম; দেবতারাও এবিষয়ে নিঃসংশয় নন। কাজেই এ তত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অন্য বর চাও তুমি।"

পড়ে কী বুঝলে?

১. নচিকেতাকে দেওয়া যমরাজের অতিরিক্ত বরটি কী ছিল?

২. যমরাজের কাছে নচিকেতা কী জানতে চেয়েছিল?

৩. কোন্ বিষয়ে দেবতাদের সন্দেহ ছিল?

নচিকেতা বলল, "তাহলে তো এ তত্ত্ব আমাকে জানতেই হবে। কারণ এবিষয়ে দেবতাদেরও যখন সন্দেহ রয়েছে, তখন আপনার মত যোগ্য বক্তা আর কোথায় পাব? আত্মতত্ত্ব জানবার এমন সুযোগ আমি ছাড়ব কেন?"

যমরাজ বললেন, "দেখ নচিকেতা, তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করে দেব। ভূ-সম্পত্তি, গাড়ী-ঘোড়া, ধন-জন প্রচুর দেব তোমাকে। পুত্র-পৌত্রাদি নিয়ে একশো বছর এ সব ভোগ কর। যদি ইচ্ছা হয়, আরো বেশী দিন, যতদিন খুশি বেঁচে থেকে এসব ভোগ কর। পৃথিবীতে মানুষ তো এই সবই চায়। আর চেয়ে দেখ, স্বর্গের অপ্সরারা সব রয়েছে এখানে। এদের নিয়ে যাও, এরা খুব ভাল নাচ-গান জানে। তোমাকে আরো অনেক রকম ভোগের জিনিস দেব; যা ভোগ করতে চাও। তাই দেব। স্বর্গে না এলে যা ভোগ করা যায় না, পৃথিবীতে যা দুর্লভ, তাও তোমাকে দিচ্ছি। মানুষ তো জীবনে এই সবের জন্যই লালায়িত; যতদিন বেঁচে থাকে, পৃথিবীতে যা কিছু ভোগ্যবস্তু আছে, সবই ভোগ করতে চায়; আবার মৃত্যুর পর আরো ভালভাবে, নিরুদ্বেগে সে সব ভোগ করার জন্য স্বর্গে যাবার স্বপ্ন দেখে। তোমাকে তো আমি সবই দিচ্ছি। এসব নিয়ে যাও; এসব না চেয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছ কেন?"

কিন্তু আজীবন এসব ভোগ করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার চেয়ে কোটিগুন বেশী আনন্দের, সীমাহীন বিরামহীন প্রতিক্রিয়াহীন আনন্দের অধিকারী হতে চায় নচিকেতা; আত্মজ্ঞানলাভের পথেই সে আনন্দ আসে। অল্পে তার মন ভরবে না। 'কড়াইয়ের ডালের খদ্দের' নয় নচিকেতা, সে মহামূল্য জিনিস নিতে এসেছে। তাই বলল, "যমরাজ, দেহ ইন্দ্রিয়ের মারফত যে সব ভোগে মানুষ আনন্দ পায়, সে সব ভোগের উপকরণ আপনি আমায় প্রচুর দিচ্ছেন, ঠিক কথা। কিন্তু যত বেশীই দিন না কেন, তাতে আর কতটুকু আনন্দ আসবে? যতই দিন মনের খিদে কখনো মিটবে না। তাছাড়া কদিন আর এসব ভোগ করব? একশো বছরই বাঁচি, আর দুশো বছরই বাঁচি, একদিন তো তার শেষ আছে! আর । যাদের মারফত ভোগ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়গুলিও তো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ হয়ে আসবে। সেজন্য এসব ভোগের দিকে আমার মন যাচ্ছে না। কাজেই এসবের প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবেন না; যা জানতে চাচ্ছি, তাই বলুন।"

পড়ে কী বুঝলে?

১. "তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করে দেব।"— কে কাকে একথা বলেছিলেন?

২. নচিকেতা ভোগের উপকরণ নিতে কেন রাজি ছিলনা?

৩. যমরাজ খুশি হয়ে নচিকেতাকে কিসের কথা শুনিয়েছিলেন?

যমরাজ বুঝলেন যে ছেলেটি শক্ত; তার আত্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রবল ও আন্তরিক, কোন ভেজাল নেই তাতে। আত্মতত্ত্ব ধারণা করার জন্য মনের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, তাও তার হয়ে রয়েছে। তাই খুশি হয়ে তাকে আত্মজ্ঞানের কথা শোনাতে লাগলেন।

জেনে রাখো

হোমানল	—	যজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নি
আহুতি	—	যজ্ঞের আগুনে ঘি দেওয়া
বিভোর	—	আনন্দে মগ্ন, বিহ্বল
সামর্থ্য	—	ক্ষমতা
জরাজীর্ণ	—	বয়সের কারণে শুকিয়ে যাওয়া, শ্রীহীন, ক্ষীণকায়
অপদার্থ	—	অযোগ্য, অসার
উৎকণ্ঠা	—	আশঙ্কা, ব্যাকুলতা
কৃতসঙ্কল্প	—	কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
ধ্রুব	—	নিশ্চিত, স্থির, নক্ষত্র।
পক্ষপাতশূন্য	—	কোন এক পক্ষকে সমর্থন না করা।
বিধান	—	নিয়ম, বিধি ব্যবস্থা
নিরপেক্ষ	—	পক্ষপাত না করা।
পুনরাবৃত্তি	—	কোন কথা শুনে আবার তা বলা।
আত্মতত্ত্ব	—	আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান, আত্মার তত্ত্ব
আন্তরিক	—	অকৃত্রিম, একান্ত মনোবাসনা।
নিঃসংশয়	—	সন্দেহ না থাকা।
প্রতিক্রিয়াহীন	—	বিপরীত অর্থাৎ উল্টোরকম ক্রিয়া না হওয়া।

জেনে রাখো

বারোটি প্রাচীন উপনিষদের অন্যতম প্রধান হলো কঠোপনিষদ। কঠ বা কাঠক ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলে এর নাম কঠোপনিষদ। 'উপ' কথাটির অর্থ সমীপে বা কাছে। গুরুর কাছে বসে এই শাস্ত্রবিদ্যা শিখতে হতো বলে উপনিষদের এই নাম। নচিকেতার উপাখ্যান উপনিষদের অংশ বিশেষ।

পাঠ পরিচয় ঃ-

নচিকেতার গল্পটি কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। 'নচিকেতা' নামটির অর্থ 'যে জানে নি'। জানেনি অথচ বিদ্যার জন্য একান্ত আগ্রহ তার রয়েছে। নচিকেতার পিতা ঋষি বাজশ্রবস যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। যজ্ঞে তিনি বিভিন্ন ধনসম্পদ, গাভি ইত্যাদি দান করেন। কিশোর নচিকেতা কৌতূহল বশত পিতাকে প্রশ্ন করে জানতে পারে যে তিনি পুত্রকে যমের কাছে দান করেছেন। নচিকেতা পিতার সত্যরক্ষার জন্য যমালয়ে উপস্থিত হলো। সব রকম প্রলোভন তুচ্ছ করে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের শিক্ষালাভই তার কাছে একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। অবশেষে নানাভাবে পরীক্ষার পর যম তার একনিষ্ঠ আকাঙ্খা দেখে তাকে আত্মজ্ঞান দানে স্বীকৃত হলেন।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তর দাও —

1. এ যজ্ঞে ঋষি তাঁর সব _____ দান করবেন।
   ক) গাভিগুলি খ) ধনসম্পদ
   গ) ভূ - সম্পত্তি ঘ) গাড়ি ঘোড়া
2. ছেলেটি _____ পুত্র নচিকেতা ।
   ক) জামদগ্নির খ) যজ্ঞবল্ক্যের
   গ) বাজশ্রবসের ঘ) দুর্বাসার
3. যমরাজ পক্ষপাতশূন্য হয়ে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে সকলকে _____ বন্টন করে দেন।
   ক) কর্মফল খ) অতুল সম্পদ
   গ) ভোগ্যবস্তু ঘ) দীর্ঘ পরমায়ু
4. নচিকেতা যমরাজ সম্বন্ধে মনে খুব _____ ধারণা নিয়ে যমপুরীতে হাজির হলো ।
   ক) ভালো খ) মন্দ
   গ) উঁচু ঘ) নিচু

অতি সংক্ষেপে লেখো —

5. যজ্ঞমন্ডপ কোথায় তৈরি করা হয়েছিল ?
6. নচিকেতা পিতাকে কী জিজ্ঞাসা করেছিল ?
7. নচিকেতার পিতা পুত্রের প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছিলেন ?
8. "অনেকের চেয়ে আমি বড়, অনেকের তুলনায় মধ্যম" — কে একথা চিন্তা করেছিল ?
9. ভালো কাজ অথবা খারাপ কাজের জন্য কেমন ফল পাওয়া যায় ?
10. যমরাজ নচিকেতার কোন গুণের জন্য খুশি হয়েছিলেন ?

সংক্ষেপে লেখো —

11. ঋষি তাঁর যজ্ঞে কী কী দান করেছিলেন ?
12. পিতা যমের কাছে তাকে দান করেছেন জেনে নচিকেতার প্রথমে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?
13. নচিকেতার আত্মবিশ্বাস জাগলো কিভাবে ?
14. ঋষি বাজশ্রবস যজ্ঞে কেমন গাভি দান করেছিলেন ?
15. যমরাজ খুশি হয়ে নচিকেতাকে কী দিতে চেয়েছিলেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো —

16. গরিব লোকদের গাভি দান করার ফলে কী উপকার হয়, বুঝিয়ে লেখো।
17. যমরাজের অন্য নাম কী? কেন তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল, নিজের কথায় লেখো।
18. নচিকেতার তিনটি বর কী কী ছিল? বিস্তারিতভাবে লেখো।
19. যমরাজ নচিকেতাকে ভোগের জন্য কী দিতে চেয়েছিলেন?
20. নচিকেতা ভোগ্যবস্তু নিতে রাজি হয়নি কেন? নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. সন্ধি বিচ্ছেদ করো —

আত্মবিশ্বাস	নিঃসংশয়
কৃতসঙ্কল্প	পুনরাবৃত্তি
অন্যমনস্ক	উৎকণ্ঠা
জরাজীর্ণ	নিরুদ্বেগে

2. নিচে একই উচ্চারণের দুটি করে শব্দ দেওয়া আছে। সেগুলির আলাদা আলাদা অর্থ লেখো —

ক)	অন্য	খ)	আপন	গ)	বান
	অন্ন		আপণ		বাণ
ঘ)	কুল	ঙ)	কৃত	চ)	নীর
	কূল		ক্রীত		নীড়

3. নিচে দেওয়া শব্দগুলি শুদ্ধ করে লেখো —

পৃথিবি	আন্তরীক
বিতিক্ষা	সর্গলোক
যমপুরি	মিত্যুভয়

4. নিচের সাধুভাষায় লেখা অংশটি চলিত ভাষায় লেখো —

স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য যে যজ্ঞ করিতে হয়, যমরাজ তাহার সমস্ত খুঁটিনাটি নচিকেতাকে শিখাইয়া দিলেন। নচিকেতা একবার শুনিয়াই তাহার পুনরাবৃত্তি করিল।

5. তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লেখো।

করতে পারো —

গরিব লোকেদের সাহায্য করার জন্য নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দান করতে পারো।

□□□

মাষ্টার মশাই

প্রভাত কুমার মখোপাধ্যায়

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে, বর্ধমান শহর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে দামোদর নদের অপর পারে নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল।

গোঁসাইগঞ্জবাসীগণের একবাক্যে ইহাই মত যে, তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোন বিষয়েই নন্দীপুরের নিকট হটে নাই এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিনজন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল সেই সময়ে রামচরণ মন্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং বলিল, "বড় বড় শহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তা হয়েছে। হুস্কুল বসিয়েছে । আরে ছাই, আমিই কি জানতাম আগে? আজ না শুনলাম — ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে হুস্কুল বলে।"

দত্তজা বলিলেন, "ওঃ ইস্কুল খুলেছে বুঝি। — তা মাষ্টার কোথা থেকে এসেছে, কিছু শুনলে?"

"সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্ধমান থেকে এনেছে। বামুনের ছেলে—হারাণ চক্রবর্তী । পনের টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক।"

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিল্ পিল্ করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া

প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব পরাভব-সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চিৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল "একি সর্বনাশ হল! নন্দীপুরের হাতে এই অপমান! আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হবে?"

হীরু দত্ত সেই রোয়েকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ভাই সকল, আমরাও ইস্কুল খুলব। আমি কলিকাতা গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আসব। ওরা ১৫ টাকা দিয়ে মাষ্টার এ্যানছে, আমরা ২৫ টাকা মাইনে দেব। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে আমরা চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাব, বসাব, বসাব — তিন সত্য করলাম। এখন যাও, তোমরা বাড়ী যাও, স্নানাহার করগে।"

"জয় গোঁসাইগঞ্জের জয়! জয় হীরু দত্তের জয়!" — সোল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্বাকার কৃশকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজীটা তাহার এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজী কথা মিশাইয়া ফেলেন।

পড়ে কী বুঝলে?

১. 'মাষ্টার মশাই' গল্পের বর্ধিষ্ণু গ্রাম দুটির নাম কী?

২. রামচরণ মন্ডল স্কুল সম্পর্কে কী বলেছিল?

৩. স্কুলের ব্যাপারে হীরু দত্তের কী মতামত ছিল?

৪. নন্দীপুর মাষ্টার মশাইয়ের কত মাইনে ছিল?

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে পরদিন ইস্কুল খুলিল। পনের-ষোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে-ঘাটে দেখা হইলে উভয় গ্রামের মাষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত, "বর্ধমানের মাষ্টার ও জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি?"

নন্দীপুর বলিত, "হলেই বা আমাদের মাষ্টারের বর্ধমানে বাড়ি, তিনিও কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওরা যখন পড়তেন তখন কি বর্ধমানে ইংরাজী ইস্কুল ছিল?"

গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন, "ঐ বেটা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে। তা এ্যাদ্দিন জানতাম না। ওটা ত মহামূর্খ! ছেলে-বেলায় কলকাতায় আমরা এক কেলাসে পড়তাম কিনা! আমরা যখন 'সেকেন বুক' পড়ি সেই সময় ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর ও আর ইংরাজী পড়েনি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা।"

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ-মাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি শুনছি"?

ব্রজ মাষ্টার ও প্রশ্ন শুনিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "একেই বলে কলিকাল! আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ওই ছেড়ে দিয়েছিল? মাষ্টার একদিন ওকে একটা 'কোশ্চেন' জিজ্ঞাসা করলে, ও 'এন্‌সার' করতে পারল না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বল্লাম। মাষ্টার আমার বল্লে, 'দাও ওর কান মলে'। আমি কান মলে দিতেই ওর মুখ-চোখ রাঙা হয়ে গলে। ও বলতে লাগল, 'আমি হলাম বামুনের ছেলে ও কায়েত হয়ে কি না আমার কানে হাত দেয়!' সেই

অপমানে ও-ই ত ইস্কুল ছেড়ে দিলে।"

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব-স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পান্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোন প্রকাশ্য স্থানে দুইজনের মধ্যে বিচার হউক— কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাক।

উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তারই নিম্নে বিচারসভা বসিবে। বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা; স্থান—উপরিউক্ত বটবৃক্ষতল; সময় সূর্যাস্ত।

ধার্য দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজমাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ-মাষ্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, "কি হে মাষ্টার মুখ রাখতে পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হারাণ মাষ্টার যেন কিছুতেই তার মানে বলতে না পারে।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি। এমন 'কোশ্চেন' জিজ্ঞাসা করব যে, শুনেই হারাণ মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে — মানে বলা তো দূরের কথা।"

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষ-তলে উপনীত হইল। বাহকেরা পূর্বেই শপ-মাদুর-শতরঞ্জি প্রভৃতি আনিয়া নিজ গ্রামের সীমারেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসীগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ-মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক-ঢোক ইত্যাদি আসিতেছে।

পড়ে কী বুঝলে?

১. হীরু দত্ত কোথা থেকে মাষ্টার নিযুক্ত করে এনেছিল?

২. গোঁসাইগঞ্জের মাষ্টার মশাইয়ের নাম কী ছিল?

৩. "হারাণ মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে" — কে একথা বলেছিল?

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ-মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই-তিন হাত মাত্র খালি জমি।

কোন্ গ্রামের মাষ্টারমশাই আগে প্রশ্ন করিবেন, ইহা লইয়া বেশ কিছুক্ষণ বাক্‌বিতন্ডা চলিল। শেষে একজন বৃদ্ধলোক বলিলেন, "আমার এই লাঠিটা উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিতে হইবে। এই লাঠির এক প্রান্ত ব্রজ-মাষ্টারের, অপর প্রান্ত হারাণ-মাষ্টারের। লাঠির যে-দিকটি আগে মাটিতে পড়িবে, সেই মাষ্টারমশাই আগে প্রশ্ন করিবেন।"

সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইবার পর লাঠি ছোঁড়া হইল এবং তাহা হারাণ-মাষ্টারের দিকে পড়িল।

নন্দীপুরের হারাণ-মাষ্টার বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ-মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ করিতে দিলেন না।

হারাণ-মাষ্টার তখন বলিলেন, "আচ্ছা বল দেখি, এর মানে কি —"

'HORNS OF A DILEMMA'

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ-মাষ্টার এই কূট প্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, "এর মানে 'উভয় সঙ্কট'—কেমন কিনা?"

"পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাষ্টার পেরেছে"— বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ-মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "শোন হারাণবাবু, আমি তোমায় কোন কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন—কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরাজী-নবীশ হয়ে আর একজন ইংরাজী নবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান ত করতে পারিনে। আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি, বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি—"I DON'T KNOW"।

হারাণ মাষ্টার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি জানি না।"

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুলবেগে নৃত্য ও চিৎকার করিতে লাগিল, "হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল, দুও—দুও।"

হারান মাষ্টার মহাবিপন্নভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গোঁসাইগঞ্জের ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া ও রামশিঙ্গা সমবেতভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

পড়ে কী বুঝলে?

১. কোন গ্রামের লোক পঙ্গপালের মতো আসতে লাগলো?

২. প্রথমে কোন গ্রামের মাষ্টার প্রশ্ন করেছিলেন?

৩. ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্নের উত্তর নন্দীগ্রামের মাষ্টার কি ভাবে দিয়েছিলেন?

৪. অবশেষে কোন গ্রামের স্কুল বন্ধ হয়ে গেল?

গোঁসাইগঞ্জ নিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ-মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল।, সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাদ্যভান্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল, হারাণ মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তথায় ইস্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাষ্টারি এবং অপত্য নির্বিশেষে গ্রামস্থ সকলের ক্ষীর, ননী, ছানা ভোজন করিতে লাগিলেন।

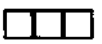

জেনে রাখো

হুস্কুল	—	স্কুল (না জেনে ইংরেজি শব্দের ভুল উচ্চারণ)
ইঞ্জিরি	—	ইংরাজী (গ্রামের লোকদের উচ্চারণ)
খর্বকায়	—	ছোটখাট শরীর/কুৎসিত
অভ্যস্ত	—	পটু
পরাস্ত	—	হারা
স্কন্ধে	—	কাঁধে
নির্বিশেষে	—	অবিশেষ, অভিন্ন, তুল্য
পঞ্চশৎ	—	পঞ্চাশ বছর
সোল্লাসে	—	অত্যন্ত খুশি হয়ে
কৃশকায়	—	রোগা
প্রকাশ্য	—	সবার সামনে
মাতব্বর	—	গ্রামের প্রধান লোক
অপ্রতিহত	—	অবাধ, অব্যাহত
বর্ধিষ্ণু	—	বনেদি, ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠা

লেখক পরিচয়

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯৩২) বাংলা কথা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক। গল্পকার রূপে তাঁর জনপ্রিয়তা একসময় রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে যায়। অথচ তিনি পেশাদার লেখক ছিলেন না। ছিলেন আইন বিশেষজ্ঞ। জামালপুর (বিহার) হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং পাটনা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর তিনি বিলাতে যান। ১৯০৩ সালে ব্যারিস্টার হয়ে প্রভাত কুমার দেশে ফেরেন। এরপর গয়া শহরে আট বছর আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকে ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন। শ্রীমতী রাধারানী দেবী ছদ্মনামে গল্প লিখে কুন্ত লীনের প্রথম পুরস্কার পান। তিনি মানসী ও মর্মবাণী-পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা চোদ্দ এবং গল্পের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর 'রত্নদীপ' উপন্যাসটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর লেখা অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ— সিন্দুর কৌটা, দেশী-বিলাতী, সতীর পতি, রমা সুন্দরী প্রমুখ। উচ্চাঙ্গের দার্শনিকতার পরিবর্তে সহজ সরল অনাবিল হাস্যরসের গল্প হিসাবে তাঁর গল্প উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য।

পাঠ পরিচয়

দুই গ্রামের মধ্যে ঈর্ষা ছিল। উভয় গ্রামের লোকেরা একে অপর গ্রামকে পরাজিত করবার চেষ্টায় থাকত। সেই জন্য নিজের নিজের গ্রামের মাষ্টার মশাইকে নিয়ে তাদের অহংকার ছিল কিন্তু কূটবুদ্ধির সাহায্যে এক গ্রামের মাষ্টার অন্য গ্রামের মাষ্টারকে অপদস্ত করে রাত্রিতে গ্রাম ছাড়াতে বাধ্য করে। যার পরিণামে সেই গ্রামের স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লেখা পড়াও বন্ধ হয়ে গেল। দুই গ্রামের বিরোধিতার কারণে শিক্ষার অভাবে গ্রামটি অন্ধকার হয়েই রইল। শিক্ষার আলো ঐ গ্রামে আর পৌঁছাল না।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. ব্রজ মাষ্টার মশাইএর বাড়ি কোথায় ছিল?
2. বিচার সভার জায়গা কোথায় ধার্য্য করা হোল?
3. নন্দীপুর গ্রাম ছেড়ে কোন মাষ্টার মশাই চলেগেলেন?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

4. গোঁসাইগঞ্জবাসীরা তিন পুরুষ ধরে কী মত পোষণ করতো ?
5. ব্রজগোপাল মিত্রের পরিচয় সংক্ষেপে দাও।
6. বৃদ্ধলোকটি প্রথমে প্রশ্ন করবার জন্য কী উপায় ঠিক করলেন ?

বিস্তারিত ভাবে উত্তর দাও

7. কী কথা শুনে গোঁসাইগঞ্জের লোকেরা উদ্বিগ্ন হোল ? বর্ণনা করো।
8. কখন ও কোন দিনে উভয় গ্রামের লোকেরা মাষ্টার মশাইদের পান্ডিত্যের পরিচয় নেওয়ার জন্য জমা হয়েছিলেন ?
9. উভয় মাষ্টার মশাইয়েরা একে অপরকে কী কী প্রশ্ন করলেন ও তার ফলাফল কী হোল ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলির চলিত রূপ লেখো

   বৎসর, পূর্বে, বাহিরে, মহাশয়, কাহাকে, তাহাদের, বদনে, স্বরে, স্কন্ধে, নৃত্য, গ্রামস্থ

2. সন্ধি বিচ্ছেদ করো।

   কিঞ্চিদধিক ——— পঞ্চাশৎ———

   উদ্বিগ্ন ——— এ্যাদ্দিন ———

   গ্রামাভিমুখে——— সূর্যাস্ত ———

3. এক কথায় প্রকাশ করো —

   যার দু'বার জন্ম হয় ———————

   যার স্ত্রী মারা গেছে ———————

   যার জন্ম আগে হয়েছে ———————

   জানার ইচ্ছা ———————

   যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে———————

4. নিচে লেখা শব্দগুলির সমাস নির্ণয় করো।

   রাজপুত্র, যথাশক্তি, নীলকণ্ঠ, চৌমাথা, চতুর্ভুজ, রাজা রাণী, রাজকন্যা, পঞ্চবটি,

5. তোমার স্কুলের মাষ্টার মশাইএর সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ অল্প কথায় লেখো।

দুঃখে যে ভেঙ্গে পড়েনি

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার হরিতকী বাগানে বিশ্বনাথ তর্কভূষণ নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ভূদেব বলে তাঁর এক ছেলে ছিল।

অসামান্য মেধাবী ছেলে। স্কুলে প্রতি বছরই সে প্রথম হত। প্রাইজ পেত।

ভূদের কৃতিত্বের সঙ্গেই স্কুলের সব পরীক্ষায় পাশ করল। এবার কলেজে পড়ার পালা। বিশ্বনাথের বড় সাধ ছেলেকে হিন্দু কলেজে পড়াবেন। কিন্তু হিন্দু কলেজে তখন মাসিক বেতন লাগত পাঁচ টাকা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাসে পাঁচ টাকা পাবেন কোথায়?

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর একজন লোক বিশ্বনাথকে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করতে সম্মত হলেন। বিশ্বনাথ ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই ভদ্রলোকটি সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। এদিকে কলেজে ভূদেবেরও মাইনে বাকি পড়তে লাগলো। এভাবে বাকি পড়ে গেল ষোল মাসের মাইনে।

কলেজের সাহেব অধ্যাপকরা ভূদেবকে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন, তার কারণ, তার মতো মেধাবী ছেলে খুব কমই দেখা যেত। সেজন্য ষোল মাস বাকি মাইনেতেও ভূদেব পড়তে পেরেছিল। কিন্তু আর বেশি দিন চলল না। একদিন কলেজের অধ্যক্ষ ভূদেবকে ডেকে জানালেন যে, সমস্ত টাকা শোধ না দিলে কলেজ থেকে তার নাম কাটা যাবে।

পড়ে কী বুঝলে?

১. বিশ্বনাথ তর্কভূষণ কে ছিলেন?

২. বিশ্বনাথ তর্কভূষণের ছেলের নাম কী?

৩. হিন্দু কলেজে মাসিক বেতন কতো লাগত?

৪. ভূদেবের কয় মাসের মাইনে বাকি পড়ে?

বালকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আশি টাকা কোথা থেকে সে পাবে? অথচ তার দৃঢ় বিশ্বাস যে একবার পরীক্ষা দিতে পারলেই সে চল্লিশ টাকা বৃত্তি আদায় করতে পারবে।

নির্জনে আপনার মনে বিমর্ষ হয়ে ছেলেটি সেই কথাই ভাবছিল। হঠাৎ দেখে, তার পিছনে একটি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। বড়ো বড়ো দুটো চোখ তার দিকে স্থির হয়ে চেয়ে আছে। ছেলেটি ভূদেবের সহপাঠী। বড়লোকের ছেলে। নাম মধুসূদন দত্ত।

সমস্ত ছেলের মধ্যে মধুসূদন ভূদেবকেই শ্রদ্ধা করত, মনে মনে ভালোবাসত। তারা দু'জনকে দুজন যেন সেই সময়েই চিনে নিয়েছিল।

মধুসূদন ভূদেবের পাশে এসে জিজ্ঞেস করল, ভাই একলা বসে কি ভাবছিস?

ভূদেব তার মাইনে না দিতে পারার ব্যাপার সমস্তই খুলে বলল।

ভূদেবের হাত দুটি ধরে মধুসূদন বলল, ভাই যদি কিছু মনে না করিস, এ টাকাটা আমার কাছ থেকে তোকে নিতে হবে। আমি বাড়ি থেকে তোর জন্যে চেয়ে নিয়ে আসব।

সহপাঠীর কাছ থেকে হাত পেতে সেই দান গ্রহণ করতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলের মন উঠল না। সে বলল, না ভাই, তাতে কাজ নেই। আমি নিজের চেষ্টায় এই টাকা সংগ্রহ করব।

এই মনস্থ করে বালক অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে তার অন্তরের বাসনা জানাল। তারপর শুধু এইটুকু দয়া প্রার্থনা করল যে, পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত যেন তার নাম কাটা না হয়।

তাই হল। ভূদেব পরীক্ষা দিল। বৃত্তি পেয়ে কলেজের মাইনে পরিশোধ করতে তার কোন অসুবিধা হল না।

পড়ে কী বুঝলে?

১. একবার পরীক্ষা দিতে পারলে ভূদেব কতো টাকা বৃত্তি আদায় করতে পারতেন?

২. মধুসূদন দত্ত কে ছিলেন?

৩. সহপাঠীর কাছ থেকে দরিদ্র ভূদেব দান গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কী?

৪. ভূদেব অধ্যক্ষকে অন্তরের কোন বাসনা জানিয়ে ছিলেন?

এই ভাবে কোনো রকমে কলেজের পড়া সাঙ্গ হল। কলেজের পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃত্তি পাওয়া ফুরিয়ে গেল।

কিছুকাল পরেই নানা অভাব অভিযোগ দেখা দিল। সংসার চলে না।

ভূদেব এখন বড় হয়েছেন । চাকরির সন্ধানে বের হলেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলেকে কেউ-ই সুপারিশ করে না।

কেরাণীগিরির জন্য ভূদেব কলকাতায় অফিসে অফিসে দরজার দরজায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

যেখানেই যান, অফিসের কর্তা জিজ্ঞাসা করেন, সওদাগরী খাতাপত্র রাখতে পার?

ভূদেব ম্লান মুখে বলেন আজ্ঞে না, সবে মাত্র সিনিয়ার স্কলার পাশ করেছি।

তখনই উত্তর আসে, স্কলার নিয়ে আমরা কি করবো বাপু! তুমি অন্যত্র দেখো।

এমনিভাবে গ্রহের ফেরে, মাসের পর মাস চলে যায়। ভূদেবের কোনও চাকরি জোটে না। যে-সে ছেলে নয় হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে ভূদেব, সিনিয়ার স্কলার ভূদেব, তারও কোনো চাকরি সেদিন জোটেনি।

এমনি ধারা অফিসের দরজা থেকে ধাক্কা খেতে-খেতে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে শোনেন, তাঁর মা আর বাবাতে কথা হচ্ছে। বাবা বলছেন, কি কুক্ষণেই না ছেলেকে ইংরেজি পড়াতে গিয়েছিলেম। এক মুঠো চাল নেই ঘরে — আর ছেলে আমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কথাগুলো শেলের মতো ভূদেবের বুকে গিয়ে লাগল। সত্যিই সে কি অপদার্থ! নিজের বাবা-মাকে দু'মুঠো খেতে দিতে পারে না।

বাড়িতে আর ঢুকলেন না। সোজা পথ ধরে আপনার মনে তিনি হাঁটতে আরম্ভ করলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা

একেবারে ভুলে গেলেন। মনে রাখলেও কোন সুবিধা হত না। কাছে একটিও পয়সা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে চুঁচুড়ায় এসে পৌঁছলেন।

ভোর হল। গঙ্গার ঘাটে বসে রইলেন সারাদিন। মনে মনে ভাবলেন, তিনি আর সংসারে ফিরবেন না। সেই গঙ্গার জলেই ডুবে মরবেন।

এই স্থির করে তিনি গঙ্গায় নামলেন। কিন্তু ডোবা হল না। গঙ্গার শীতল জলের স্পর্শে তাঁর মনের অবসাদ হঠাৎ কেটে গেল। জল থেকে উঠে পড়লেন। রোদের মধ্যেই আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

ক্ষিদের সমস্ত দেহ ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু অন্ন সংগ্রহের কোনো সম্ভাবনা নেই। এইভাবে বিকেলও কেটে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত হয়ে এক বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাঁটতে হাঁটতে পরনের কাপড় অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে।

হঠাৎ সেই সময় একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে ভূদেবের সেই মূর্তি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাপু?

পড়ে কী বুঝলে?

১. ভূদেব কোন কাজের জন্য কলকাতায় অফিসে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন?

২. ভূদেব যেখানেই কাজের জন্য যান অফিসের কর্তা কী জিজ্ঞাসা করেন।

৩. একবার ভূদেব হাঁটতে হাঁটতে কোথায় এসে পৌঁছলেন?

৪. ভূদেব সবার আগে কিসের চাকরি পান?

ভূদেব মনে মনের লজ্জা ত্যাগ করে বললেন, ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে আমি কিছু খাইনি।

বৃদ্ধ ভূদেবকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়ে বিশেষ যত্ন করে নিজে তাঁকে খাওয়াতে বসালেন। বড়ো লোকের বাড়ি, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও প্রচুর।

সেই নানারকমের বিচিত্র খাদ্য দেখে হঠাৎ ভূদেব কেঁদে ফেললেন। বাড়িতে তাঁর মা-বাবা আধ-পেট খেয়ে রয়েছেন, তিনি কিভাবে এই খাদ্য মুখে তুলবেন?

ভূদেব বৃদ্ধকে তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। তবে বৃদ্ধের অনুরোধে তাঁকে কিছু খেতেই হল।

ভূদেবের ব্যবহারে বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে বৃদ্ধ সেইদিনই ভূদেবকে তাঁর বাড়ির ছেলেদের জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করলেন।

এইভাবে চাকরি-জীবন শুরু হল ভূদেবের। নিজের যোগ্যতায় পরে ভাল চাকরি পেলেন।

এই ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন চাকরি থেকে পেনশন গ্রহণ করেন, সেই সময়ে বাঙলাদেশের শিক্ষা বিভাগে তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে বড়ো প্রথম বাঙালী কর্মচারী। তাঁর বেতন ছিল পনেরো শ' টাকা। শেষ জীবনে দেশবাসীর সৎশিক্ষা ও সুচিকিৎসার জন্য তিনি এক লাখ ষাট হাজার টাকা দান করে যান। তিনি আমাদের সকলের প্রণম্য।

□□□

জেনে রাখো

আকাশ ভেঙে পড়া	—	হঠাৎ বিপদে পড়ে দিশাহারা হওয়া।	পরিশোধ	—	ঋণ, ধার শোধ করা
অসামান্য	—	অসাধারণ	স্কলার	—	বিদ্বান
প্রাইজ	—	পুরস্কার	শেল	—	প্রাচীন অস্ত্র, শূল (সংস্কৃত শল্য থেকে এসেছে) কামানের গোলা (ইংরাজি Shell) (শেল)
দরিদ্র	—	গরীব			
সম্মত	—	রাজি হওয়া			
মেধাবী	—	বুদ্ধিমান			
অধ্যক্ষ	—	মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	প্রণম্য	—	প্রণামের যোগ্য
বৃত্তি	—	ছাত্রের পড়ার জন্য নিয়মিত অর্থ সাহায্য।			

লেখক পরিচিতি —

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৬৪) গল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয়ের লেখক। বিশেষ করে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহাতীত। এ ছাড়াও কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, চিত্র পরিচালক এবং অভিনেতা হিসাবে ও তাঁর পরিচিতি আছে। তিনি বেতার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'বিদ্যার্থী মন্ডল', পল্লী মঙ্গল' আসরের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘদিন ধরে 'গল্প দাদুর আসরের' সুদক্ষ পরিচালক হিসাবেও তাঁর সুনাম আছে। গল্প ভারতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধে উল্লেখযোগ্য — মহীয়সী মহিলা, সান-ইয়াৎ-সেন, শতাব্দির সূর্য। অনুবাদক রূপেও তাঁর খ্যাতি আছে। সেক্সপীয়রের কমেডি, ট্র্যাজেডি, গোর্কির মাদার, কুলী। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি, এইচ্.জি.ওয়েলস্ - এর গল্প তাঁর সাবলীল অনুবাদ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. বিশ্বনাথ তর্কভূষণ কোথায় বাস করতেন?
2. বিশ্বনাথ ছেলেকে কোন কলেজে ভর্তি করিয়েছিলেন?
3. ভূদেব কেমন ছাত্র ছিলেন।

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ-

4. বিশ্বনাথ কেমন করে ভূদেবকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়েছিলেন?
5. কি করে ভূদেবের ষোল মাসের মাইনে বাকি পড়ে গেল?
6. বালক ভূদেবের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কেন?

বিস্তারিতভাবে লেখো

7. মধুসূদনের সঙ্গে ভূদেবের বন্ধুত্বের পরিচয় এবং ভূদেবের চারিত্রিক দৃঢ়তার যে পরিচয় পাঠে পাওয়া যায় তার বর্ণনা নিজের ভাষায় করো।
8. কোন কথাটি ভূদেবের বুকে শেলের মতো লাগল? এরপর তিনি কী করতে চাইলেন? পাঠ অবলম্বনে লেখো।
9. ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম চাকরি কী ভাবে পান?
   শেষ জীবনে দেশের জন্য তাঁর কী অবদান ছিল? লেখো।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটি কথা জেনে রাখো

বিহারের শিক্ষা বিস্তারে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা বিহারবাসীর কাছে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে

থাকবে। তিনি দীর্ঘকাল বিহারে স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন। এই সূত্রে বিহারের গ্রাম ও শহরের হিন্দী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার দুরবস্থা দেখে বিশেষ দুঃখিত হন। এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য সে সময়ে বিহারের নানা জায়গায় আদর্শ হিন্দী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভূদেব বিহারের আদালতগুলিতে ফারসীর বদলে হিন্দী ভাষার প্রচলন করেন। বাংলাভাষার বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তিনি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। হিন্দীভাষা যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে তার মূলেও ভূদেবের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

বাঁকীপুরের মোক্তার মুন্সী রঘুবর দয়াল প্রমুখ কৃতজ্ঞ বিহারবাসীরা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে 'ভূদেব হিন্দী মেডাল ফান্ড' স্থাপন করেছিলেন। যে ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় হিন্দী রচনায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতো, তাকে একটি রৌপ্য পদক ও হিন্দী গ্রন্থ ঐ ফান্ড থেকে দেওয়া হতো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো —

ধর্মাধর্ম	দেবালয়
মহোৎসব	অপরাপর
রাজৈশ্বর্য	যথেষ্ট
পুস্তকাগার	পূর্ণেন্দু

2. নিচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো —

কৃতিত্ব	দরিদ্র
মেধাবী	বিমর্ষ
বিশ্বাস	মনস্থ

3. নিচের সাধুভাষায় লেখা অংশটিকে চলিত ভাষায় লেখো —

তিনি বাড়িতে আর ঢুকিলেন না। সোজা পথ ধরিয়া আপনার মনে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। মনে রাখিলেও কোন সুবিধা হইতোনা। একটিও পয়সা ছিল না তাঁহার নিকটে। হাঁটিতে হাঁটিতে চুঁচুড়ায় আসিয়া পৌঁছাইলেন।

4. এক কথায় প্রকাশ করো —

যে কন্যার বিবাহ হয়নি।
যা ভাবা যায় না।
যা বিশ্বাস করা যায় না।
যিনি ইতিহাস জানেন।
যা দেখা যাচ্ছে।
যে আদবকায়দা জানে না।

5. কারক কথাটির অর্থ 'যে কাজ করে'। বাক্যে সবসময়ই কোন না কোন কাজের কথা বলা হয়। যেমন — সে খেলছে। আমি পড়ছি। তুমি বাড়ি যাচ্ছ। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদ ও বিশেষ্যর যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় কারক। কারক ছয় প্রকার— কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ কারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক 'সম্বন্ধকে পদ বলা হয়ে থাকে। নিচে একটি বাক্য দেওয়া হলো। এই বাক্যটিতে সব কটি কারক পাওয়া যায়। কোন শব্দে কী কারক হয়েছে, তা লেখো —

"রাজা দশরথ অযোধ্যায় রাজভান্ডার থেকে দরিদ্রদের স্বহস্তে বস্ত্রধনাদি দান করছেন।"

দাশুর কীর্তি

সুকুমার রায়

নবীনচাঁদ ইস্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুল সুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। ডাকাতে ধরেছিল? বলিস কীরে? ডাকাত না তো কী? বিকাল বেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরবার সময় ডাকাতরা তাকে ধরে তার মাথায় চাঁটি মেরে তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচ্‌কিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় বলে গেল "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক—নইলে দড়াম করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব!" তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় তার বড় মামা এসে তার কান ধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন — রাস্তায় সঙ্ সেজে একা কী করা হচ্ছিল? নবীনচাঁদ কাঁদ কাঁদ গলায় বলে উঠল, "আমি কী করব আমায় ডাকাতে ধরেছিল।" শুনে তার মামা প্রকান্ড এক চড় তুলে বললেন "ফের জ্যাঠামি"। নবীনচাঁদ দেখল মামার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ, সত্যি সত্যিই তাকে যে ডাকাত ধরেছিল, একথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত! সুতরাং তার মনের দুঃখ এতদিন মনের মধ্যেই চাপা ছিল।

পড়ে কী বুঝলে?

১. নবীনচাঁদ স্কুলে এসে কী বললো?

২. বিকালবেলায় কে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল?

যা হোক ইস্কুলে এসে তার দুঃখ অনেকটা বোধ হয় দূর হতে পেরেছিল। কারণ স্কুলে অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল। এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুসকুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে স্বীকার করেছিল। দু-একজন যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরানো বলে সন্দেহ করেছিল তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বলল, ওটা তো জুতোর ফোস্কা, তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বললে, যাও তোমাদের কাছে আর কিছুই বলব না। কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনা হল না।

পড়ে কী বুঝলে?

১. স্কুলে এসে নবীনের দুঃখ অনেকটা দূর হয়েছিল কেন?

২. পাগলা দাশু কেমন ভাবে ক্লাসে ঢুকেছিল?

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে ঢং ঢং করে স্কুলের ঘন্টা পড়ে গেল। সবাই যে যার ক্লাসে চলে গেলাম। এমন সময় দেখি পাগলা দাশু একগাল হাসি নিয়ে ক্লাসে ঢুকছে। আমরা বললাম, শুনেছিস? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল। যেমন বলা অমনি দাশরথী হঠাৎ হাত পা ছুড়ে বইটই ফেলে খ্যাঁ, খ্যাঁ করে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে একবার চিৎ হয়ে, একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরা তো অবাক! পন্ডিত মশাই ক্লাসে এসেছেন, তখনও পুরোদমে তার হাসি চলছে। সবাই ভাবল ছোঁড়াটা খেপে গেল নাকি। যা হোক খুব খানিকটা লুটোপুটির পর সে ঠান্ডা হয়ে বইটই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। পন্ডিত মশাই বললেন, ওরকম হাসছিলে কেন? দাশু নবীনকে দেখিয়ে বলল, ওই ওকে দেখে। পন্ডিত মশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাসের কোণায় দাঁড় করে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই। সে সারাটি ঘন্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল।

টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল। "কীরে দেশো বড়ো যে হাসতে শিখেছিস?" দাশু বললে, "হাসব না? তুমি ধুচুনি মাথায় দিয়ে কী রকম নাচটা নেচেছিলে। সে তো আর তুমি নিজে দেখোনি। দেখলে বুঝতে কেমন মজা!" আমরা সবাই বললাম, সে কীরকম? ধুচুনি মাথায় নাচছিল মানে? দাশু বলল, তাও জানো না? ওই কেষ্টা আর জগাই, ওই যা। বলতে না বারণ করেছিল? আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কী বলছিল ভালো করেই বলোনা। দাশু বলল কালকে কেষ্টদের বাগানের পিছন দিয়ে নবা একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময় দুটো ছেলে তাদের নাম বলতে বারণ — তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুচুনির মতো কী একটা চাপিয়ে তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচকিরি দিয়ে পালিয়ে গেল। নবু

ভয়ানক রেগে বলল, তুই তখন কী করছিলি? দাশু বলল, তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত পা ছুড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বললাম — ফের নড়বি তো দড়াম করে মাথা উড়িয়ে দেব। শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তাই আমি তোমার বড়োমামাকে ডেকে আনলাম। নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা, তেমনি তার দেমাক—সেই জন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না। তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ছেলে মানুষ সে, ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললে, তবে যে নবীনদা বলেছিল "তাকে ডাকাতে ধরেছে?" দাশু বললে "দুর বোকা!" কেষ্টা কী ডাকাত? বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাসে পড়ে। তার গায়ের বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে

পড়ে কী বুঝলে?

১. নবীন কোথা দিয়ে একলা বাড়ি ফিরছিল?

২. নবীনচাঁদ কাকে দেখে শিকারী বেড়ালের মতো ফুলে উঠলো?

৩. মোহনচাঁদ কোন ক্লাসে পড়তো?

দেখামাত্র শিকারি বেড়ালের মতো ফুলে উঠল। কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না। খানিকক্ষণ কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে দেখল, থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল।

কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি, নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে। সে আমাদের চাইতে অনেক বড়ো। তাকে ওরকমভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম, এবার একটা কান্ড হবে। মোহন এসেই বলল, কেষ্টা কই, কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে। তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। এখন নবীনচাঁদ বলল ওই দাশুটা সব জানে। ওকে জিজ্ঞাসা কর। মোহন বলল, কিহে ছোকরা তুমি সব জানো নাকি? দাশু বলল, না সব আর জানব কোত্থেকে—এই তো সবে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। একটু ইংরেজি জানি, ভূগোল, বাংলা, জিওমেট্রি। মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বলল, সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জানো কি না? দাশু বলল, ঠ্যাঙায়নি তো—মেরেছিল। খুব অল্প মেরেছিল মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বলল, খুব অল্প মেরেছে না, তবু কতখানি শুনি। দাশু বলল, সে কিছুই না—ওরকম মারলে একটুও লাগে না। মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বললে, তাই নাকি? কীরকম মারলে পরে লাগে? দাশু খানিকটা মাথা দুলিয়ে তারপর বলল, ওই সেবার হেডমাষ্টার মশাই তোমায় যেমন বেত মেরেছিলেন সেইরকম। এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান মলে চিৎকার করে বলল, দেখ বেয়াদব! ফের জ্যাঠামি করবি তো চাবকিয়ে লাল করে দেব। কাল তুই সেখানে ছিলি কিনা? আর কী কী দেখেছিলি সব খুলে বলবি কিনা?

আগেই তো দাশুর মেজাজ কেমন পালটে গেছে। সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে বসল- কিল, , ঘুঁষি, চড়, আঁচড়, কামড় সে এমনি চটপট চালিয়ে গেল যে, আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধহয় জন্মেও ভাবেনি যে ফোর্থ ক্লাসের একটা রোগা ছেলে তাকে এমনভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে। তাই সে একেবারে থতমতো খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে চিত করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল। ম্যাট্রিক ক্লাসের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেলত তাহলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হত।

পড়ে কী বুঝলে?

১. কারা দাশুর হাত থেকে মোহনকে বাঁচিয়ে ছিলো?

২. জিলিপির জন্য দাশু বন্ধুদের কোথায় যেতে বলেছিল?

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হ্যাঁরে নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন? কেষ্টা বলল, ওই দাশুটাই তো শিখিয়ে ছিল ওরকম করতে আর বলেছিল তাহলে একসের জিলিপি পাবি। আমরা বললাম, কৈ আমাদের তো ভাগ দিলি না? কেষ্টা বলল, "সে কথা আর বলিস কেন?" জিলিপি চাইতে গেলাম, হতভাগা বলে কিনা আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে। যত চাস জিলিপি পাবি।

□□□

জেনে রাখো

পিরান	—	ঢিলা জামা	লাঞ্ছনা	—	নিন্দা, অপমান।
সুস্পষ্ট	—	অত্যন্ত স্পষ্ট	শিকারী	—	যে শিকার করে।
ধুচুনি	—	চাল ইত্যাদি ধোওয়ার ছিদ্রযুক্ত পাত্র	জ্যাঠামি	—	পাকামি, বাচালতা, অকাল পক্কতা।
দেমাক	—	অহংকার	ময়রা	—	যে মিষ্টি বিক্রী করে।

লেখক পরিচিতি —

সুকুমার রায় (১৮৮৭—১৯২৩)। পিতা প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। মাতামহ সমাজ সংস্কারক, খ্যাতনামা ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিচিত্র স্বাদের খেয়াল রসের স্রষ্টারূপে প্রবাদ প্রতিম সুকুমার রায়ের পরিচিতি। ছেলেবেলা থেকেই মুখে মুখে ছড়া বানাতেন। ছবি আঁকার নেশা ছিল। ফটোগ্রাফিতেও আগ্রহী ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় নাটক অভিনয় এবং ছোটদের হাসির নাটক লেখা শুরু করেন। বি.এস.সি. পাশ করে ১৯১১ সালে ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরু প্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ্ পেয়ে বিলাত যান। দেশে ফিরে পিতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'ইউ রায়-এন্ড' সন্স্' এ যোগ দেন। বিলাতে থাকাকালীন পিতৃ - প্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য নিয়মিত লেখা ও ছবি পাঠাতেন। তাঁর লেখায় উদ্ভট রসের সফল প্রয়োগ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন "তাঁর (সুকুমার রায়) স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেইজন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।" কিশোরদের জন্য বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করেন, যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, আবোল তাবোল, অবাক জলপান, ঝালাপালা। লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হিংসুটি, ভাবুকসভা, চলচিত্র চঞ্চরি, শব্দকল্পদ্রুম ইত্যাদি।

পাঠ পরিচয় —

'দাশুর কীর্তি' সুকুমার রায়ের লেখা একটি নির্মল হাসির গল্প। দুষ্টুবুদ্ধিতে দাশুর জুড়ি ছিল না। তারই পরামর্শে কেষ্টা আর জগাই নবীনচাঁদকে জব্দ করার জন্য এই কাজ করেছিল।

এধরণের খেলা স্বাভাবিক ভাবেই কিশোর মনকে হাসি আর মজার খোরাক জোগায়। জীবন হয়ে ওঠে উপভোগ্য আর সুখকর। দাশুর কাহিনি আমাদের এক পরিচ্ছন্ন কৌতুকের জগতে পৌঁছে দেয়।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. বাঁদিকের বাক্যাংশের সঙ্গে ডানদিকের বাক্যাংশ মিলিয়ে লেখো —

বাঁ দিক	ডান দিক
ক) নবীনচাঁদ দেখলো	ক) একগাল হাসি নিয়ে ক্লাসে ঢুকছে।
খ) মামা প্রকান্ড এক চড় তুলে বললেন	খ) একা কী করা হচ্ছিল?
গ) রাস্তায় সঙ সেজে	গ) কাদা জলের পিচকিরি দিয়ে গেল।
ঘ) নতুন কেনা শখের পিরানটিতে	ঘ) মামার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা ।
ঙ) পাগলা দাশু	ঙ) ফের জ্যাঠামি।

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

2. নবীনচাঁদের পক্ষে কোন্ কথা বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত ছিল?
3. 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক — নইলে দড়াম করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।"— কে কাকে একথা বলেছিল?

4. নবীনচাঁদের কথা শোনবার জন্য কারা ব্যস্ত হয়েছিল?
5. পন্ডিত মশাই দাশুকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন?

সংক্ষেপে লেখো ঃ-

6. কখন স্কুলের ঘন্টা পড়েছিল? সে সময়ে সবাই কী করেছিল?
7. ক্লাসে ঢুকে দাশু কোন্ কথা শুনলো এবং তার ফলে সে কী করলো?
8. বড় মামার বকুনি খেয়ে নবীনচাঁদ কী অজুহাত দিয়েছিল? তার কথা মামা বিশ্বাস করেছিলেন কি?
9. কেষ্টা কী বলেছিল যার জন্য নবীনচাঁদ রেগে যায়?
10. নবীনচাঁদকে কেউ পছন্দ করতোনা কেন?

বিস্তারিতভাবে লেখো

11. নবীনচাঁদ কে কি সত্যিই ডাকাতে ধরেছিল? এর ফলে তার কী অবস্থা হয়েছিল, বিস্তারিতভাবে লেখো।
12. পাগলা দাশু কি ভাবে নবীনচাঁদের ডাকাতে ধরার আসল কাহিনি বন্ধুদের কাছে বলেছিল, তার বর্ণনা দাও।
13. মোহনচাঁদ কে ছিল? দাশু তাকে কেমন ভাবে আক্রমণ করেছিল, নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি —

1. নিচের দাগ দেওয়া শব্দগুলির কারক ও বিভক্তি লেখো —
   ক) আমায় ডাকাতে ধরেছিল ।
   খ) পাগলা দাশু একগাল হাসি নিয়ে ক্লাসে ঢুকেছে।
   গ) মোহন চাঁদ ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে।
   ঘ) হেড মাস্টার মশাই তোমায় বেত মেরেছিলেন।
   ঙ) ময়রার দোকানে যা, যত চাস জিলিপি পাবি।
2. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

মোহন চাঁদ	হেডমাস্টার
পন্ডিত মশাই	বাবুয়ানা
কাদা জল	বেয়াদব
প্রকান্ড	বিশ্বাস

3. প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কতগুলি শব্দের সমষ্টি বা বাক্যাংশ প্রচলিত আছে, যেগুলি এক একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলিকে প্রবাদ বাক্য বা বাগ্‌ধারা বলা হয়। যেমন, অরণ্যে রোদন (বৃথা চেষ্টা), আকাশ কুসুম (অলীক কল্পনা), অকাল কুষ্মান্ড (অপদার্থ, অকর্মণ্য) ইত্যাদি।
   নিজের প্রবাদবাক্যগুলিকে অর্থ বুঝে বাক্যে ব্যবহার করো—

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া	ডুমুরের ফুল
আঠার মাসে বছর	গোড়ায় গলদ
ইঁচড়ে পাকা	বুদ্ধির ঢেঁকি
উত্তম মধ্যম	কেউ কেটা

4. নিচের বাক্যাংশ গুলিকে এক কথায় প্রকাশ করো —
   যার রসবোধ আছে
   যার মমতা নেই
   যিনি ব্যাকরণ জানেন
   যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন
   যার ভাতের অভাব আছে
5. পাগলা দাশুর দুষ্টুমির বিষয়ে নিজের কথায় একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

করতে পারো —

'দাশুর কীর্তি' কাহিনিটির বিষয়বস্তু কৌতুক অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করতে পারো।

স্বাধীনতার সৈনিক

অচিন্ত্য কুমার মুখোপাধ্যায়

উনিশশো' পাঁচ সালে ভাগীরথীতে যে তুফান উঠেছিল পঞ্চনদেও লেগেছিল তার ঢেউ। বঙ্গভঙ্গ রদ করার দাবিতে ১৯০৭ সালে বঙ্গদেশ যখন তোলপাড় হচ্ছে পাঞ্জাবেও তখন ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে জোর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। সরকার কৃষকদের জোতজমি কেড়ে নিচ্ছিল। তাই বিক্ষুব্ধ কৃষকরা উত্তাল আন্দোলনে ফেটে পড়ল। এই আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন সর্দার অজিত সিং। সরকার তাঁকে সুদূর ব্রহ্মদেশের কারাগারে নির্বাসিত করল আর তাঁর দাদা কিষন সিং ও ছোট ভাই স্বরণ সিংকে বন্দি করল লাহোরের জেলে। এমনইভাবে গোটা পরিবারকে পিষে মারতে সরকার যখন উদ্যত ঠিক তখনই এই পরিবারে জন্ম নিল এমনই এক দুর্দমনীয় বহ্নিশিখা ব্রিটিশশাসকের বুকে যে জাগিয়ে তুলেছিল আতঙ্কের বিভীষিকা। এই বহ্নিশিখার নাম ভগৎ সিং। কিষন সিং-এর পুত্র ভগতের জন্মের পর-পরই স্বাধীনতার সংকল্প বুকে নিয়ে সর্দার অজিত সিং দেশান্তরী হয়ে গেলেন আর স্বরণ সিং অমানুষিক অত্যাচারে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত

হয়ে জেলের ভিতরে মারা গেলেন।

রক্তে দেশপ্রেমের আগুন নিয়ে ভগৎ বড়ো হতে লাগলেন। বাড়িতে তাঁদের সারা-দেশের বিপ্লবীরা আসতেন, আলাপ-আলোচনা শলাপরামর্শ চলত। ভগতের বয়েস যখন আট-নয় বছর স্বাধীনতার আন্দোলনে পাঞ্জাব তখন উত্তাল হয়ে উঠল। বিদেশবাসী হাজার হাজার পাঞ্জাবি অস্ত্র হাতে লড়ে ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্যে দেশে ফিরলেন। বাংলার রাসবিহারী বসু তাঁদের অধিনায়ক হলেন। এই 'গদর' বিপ্লবীরা শেষ বর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেলেন। সরকার তাঁদের দলে দলে হত্যা করল, বন্দি করল। ভগৎ দেখলেন — বিশ বছরের যুবক মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী সর্দার কর্তার সিং হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরলেন । ভগৎ সেদিন তাঁকে আপন হৃদয়ের রাজারূপে বরণ করে নিলেন।

গ্রামের স্কুলের পড়া সেরে উঁচু ক্লাসে পড়ার জন্য ভগৎ যখন লাহোরে এসেছেন তখন অমৃতসরের কুখ্যাত নরমেধযজ্ঞ জালিয়াওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ঘটে গেল। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাস সেটা । বৈশাখী উৎসবের দিন হাজার

হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে সমবেত হয়েছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে। চারদিক বাড়ি দিয়ে ঘেরা এই পার্কটার প্রধান প্রবেশ-পথ অতর্কিতে আটকে দিয়ে মুষলধারে ষোলশ' রাউন্ড গুলি চালিয়ে দুই সহস্রাধিক নরনারী-শিশুকে হত-আহত করল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী। এই ঘটনায়, যন্ত্রণায় ছট ফট করতে করতে তেরো বছরের কিশোর ভগৎ অমৃতসরে ছুটে গেলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তভেজা মাটি দু-হাত ভরে তুলে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন—নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ও লাঞ্ছনার অবসান ঘটাতে চেষ্টা করে যাবেন।

পড়ে কী বুঝলে?

১. ভগৎ সিং এর পিতার নাম কী?

২. বাংলার রাজবিহারী বসু কাদের অধিনায়ক হন?

৩. জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকান্ড কবে ঘটে।

জালিয়ানওয়ালার ক্ষোভের পথ বেয়ে এল অসহযোগ আন্দোলন — সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুল-কলেজ, আফিস-আদালত বর্জন। বাংলায় গড়ে উঠল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপভাবে প্রদেশে প্রদেশে স্থাপিত হল জাতীয় বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। ভগৎ স্কুল ছাড়লেন; দিনরাত পড়াশোনা করে জাতীয় কলেজে ভরতির যোগ্যতা অর্জন করলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক হবার আকাঙ্খা এতদিন মনের অন্তঃপুরে ছিল বন্দি। এবার সংগ্রামের ময়দানের সামনে এসে পড়লেন ভগৎ। কলেজের পড়া ছাড়াও দিনরাত নানা দেশের ইতিহাস, রাজনীতি, বিপ্লব-কাহিনি অধ্যয়ন, তর্ক-আলোচনা চলতে লাগল। সুদক্ষ কণ্ঠশিল্পী ভগৎ দেশপ্রেমের গানে অভিনয়ে মাতিয়ে তুলতে লাগলেন মানুষকে। সরকার ভয় পেয়ে নিষিদ্ধ করে দিলেনতাঁদের নাটকের দলটিকে।

এফ.এ. পাস করলেন ভগৎ। বি.এ. পড়ছেন যখন তখন তাঁর দুই ছেলে হারানো ঠাকুরমা প্রিয় নাতির বিয়ে দিতে পাগল হলেন। ভগৎ পালিয়ে এলেন কানপুরে। এখানে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকত্ব গ্রহণ করলেন। সক্রিয় কর্মী হলেন। বিপ্লবী গুপ্ত সংস্থা হিন্দুস্থান প্রজাতন্ত্র সংঘের। বৃত্তিরূপে গ্রহণ করলেন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা।

কিছুকাল পরে তিনি আবার দেশে ফিরলেন। লাহোরের যুবকদের নিয়ে গড়লেন নওজোয়ান ভারত সভা। জনগণের মনে দেশপ্রেম জাগানো আর যুবকদের মধ্য থেকে সংগ্রামের সৈনিক গড়া তাঁর কাজ। অঢেল স্বাস্থ্য আর অমিত শক্তি ও সাহস ভগতের। যেমন তাঁর প্রভূত পড়াশোনা তেমনই তাঁর কলমের জোর আর বলার শক্তি। ভগৎ হয়ে উঠলেন পাঞ্জাবের যুবকদের নেতা। পুলিশ তাঁকে লাহোর দুর্গে মিথ্যা অজুহাতে বন্দি করে রাখল কিছুদিন।

এদিকে দেশের মানুষ তখন স্বাধীনতার আকাঙ্খায় উদ্বেল। অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার বইছে। কী করে চরম আঘাত হেনে বৃটিশকে দেশছাড়া করা যায় তারই পরিকল্পনা করার জন্য ভগৎ সারা দেশের বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে দিল্লিতে গোপন সম্মেলন করলেন। ঠিক হল, শুধু ব্রিটিশকে তাড়ালেই হবে না, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপর থেকে মানুষের সব শোষণ ঝেড়েমুছে ফেলতে হবে। গড়তে হবে সমাজতন্ত্র। হিন্দুস্থান প্রজাতন্ত্র সংঘের নাম পালটে রাখা হল হিন্দুস্থান সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সংঘ। এ-ও ঠিক হল যে, দু-একশো বিপ্লবীর বোমাবন্দুকে স্বাধীনতা আসতে পারে না; স্বাধীনতার জন্য লাখো লাখো দেশবাসীর জানপ্রাণ লড়াই চাই। সংঘ হবে এই লড়াই-এর সশস্ত্র সৈন্যদল। দিল্লিতে ভগতকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে উঠল। ভগৎ পুলিশ সেজে পুলিশকে বোকা বানিয়ে লাহোরে চলে এলেন।

সেটা ১৯২৮ সাল। আন্দোলনকে লোভ দেখিয়ে থিতিয়ে দেবার জন্য দেশীয় লোকদের হাতে ছিটেফোঁটা ক্ষমতা দেবার ফন্দি আঁটল ব্রিটিশরাজ। এই উদ্দেশ্যে সাইমন সাহেব এক দল ইংরেজকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে এলেন। দেশের মানুষ সইল না এই তামাশা। 'সাইমন ফিরে যাও' রবে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। সাইমন কমিশন যেখানেই গেল

সেখানেই ধর্মঘট, হরতাল, বিক্ষোভ হতে লাগল। ৩০ অক্টোবর সাইমন কমিশন লাহোরে আসতে প্রবীণ নেতা লালা লাজপত রায়কে সামনে নিয়ে কালো পতাকাধারী এক বিশাল শোভাযাত্রা বিক্ষোভ দেখাল। ভগতের নেতৃত্বে যুবকরা ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে। খ্যাপা কুকুরের মতো পুলিশের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের উপর। লাঠির ঘায়ে আহত হল বহু মানুষ। লালাজি রক্তাক্ত দেহে ভুলুণ্ঠিত হলেন। আঘাতে, লাঞ্ছনায়, অপমানে লালাজীর মৃত্যু হল। এত বড়ো এক জন নেতার এই লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর কিন্তু কোনো প্রতিকার হল না। দেশে লোক অপমানে হতাশায় ভেঙে পড়ল।

এইসময়ে জাতির মুখ থেকে কলঙ্কের কালিমা মুছিয়ে দিতে বীরবিক্রমে এগিয়ে এলেন ভগৎ সিং। লালাজির মৃত্যুর ঠিক এক মাসের মাথায় লাহোরের পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে দিনের আলোতে লালাজির হত্যাকারী পুলিশকর্তা স্যান্ডার্স, ভগৎ ও তাঁর সহকর্মি রাজগুরুর পিস্তলের গুলিতে পথের ধুলোয় গড়িয়ে পড়ল। আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল ভারতময়। ভগৎ সেইদিনই লাহোর ত্যাগ করলেন। পুলিশ তাঁকে ধরবার জন্য চারদিকে ওত পেতে বসেছিল। এই নিঃশঙ্ক বীর তাদেরই বুকের উপর দিয়ে পুরোদস্তুর সাহেব সেজে ট্রেনে চাপলেন। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু লিখেছেন—ভগৎ হয়ে উঠলেন একটা প্রতীক। সারা উত্তর ভারতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল তাঁর নাম। তাঁর নামে রচিত হল অজস্র গীত।

ভগৎ চলে এলেন কলকাতায়। মিলিত হলেন বাংলার বিপ্লবী নেতা যতীন দাসের সঙ্গে। বাংলার বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। তারপর যতীন দাসকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন আগ্রায়। সেখানে বসে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন ভারতময় বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টির। এদিকে অসহযোগ আন্দোলন তখন বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারের অত্যাচারও হয়েছে প্রবলতর। শ্রমিকনেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জননিরাপত্তা আইন ও শ্রমবিরোধ আইন জারি করে লড়াইয়ের পথ চিরতরে বন্ধ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভগৎ ও তাঁর সহকর্মিরা স্থির করলেন এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হবে এমনভাবে যাতে সরকার সংযত হয়, জনগণের মন থেকে ভয় কেটে যায় এবং আন্দোলনের মরা গাঙে জোয়ার আসে।

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল পাঞ্জাবের বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং বাংলায় বিপ্লবী সন্তান বটুকেশ্বর দত্তকে সঙ্গে নিয়ে সুকৌশলে ঢুকে গেলেন দিল্লির কেন্দ্রীয় আইনসভাকক্ষে। সেখানে তখন শ্রমবিরোধ আইন পাস হতে চলেছে। বক্তৃতার পর আইনটি যখন পাস হতে যাবে তখনই কক্ষের মধ্যে ভগতের নিক্ষিপ্ত দুটি বোমার প্রচন্ড আওয়াজে আইনসভাগৃহ থরথর করে কেঁপে উঠল। ধোঁয়ায় ভরে গেল চারদিক। সভ্যেরা যখন ভয়ে হুড়মুড় করে পালাচ্ছেন তখন ভগৎ-বটুকের কণ্ঠ মুহুর্মুহু গর্জন করে উঠল—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক। ভারতের মাটিতে সেইদিনই প্রথম—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি উত্থিত হল।

পড়ে কী বুঝলে?

১. লাহোরের যুবকদের নিয়ে ভগৎ সিং কোন সভা গড়লেন?

২. হিন্দুস্থান প্রজাতন্ত্র সংঘের নাম পালটিয়ে কী রাখা হলো?

৩. ভগৎ সিং কলকাতায় এসে প্রথমে কার সঙ্গে দেখা করেন?

৪. দিল্লির কেন্দ্রীয় আইন সভা কক্ষে কারা ঢুকে পড়েছিল?

চারিদিকের হুড়োহুড়ির মধ্যে তাঁরা অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁদের তা নয়; বিচারের মঞ্চ থেকে তাঁরা তাঁদের আদর্শ ও লক্ষ্য দেশবাসীকে জানাতে চান; আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে জাতিকে সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করতে চান। তাই এক পা-ও নড়লেন না তাঁরা। গ্রেফতারের পর অমানুষিক অত্যাচারে ভগতের বলিষ্ঠ দেহ শীর্ণ হয়ে

গেল। তবুও মুহূর্তের জন্য লড়াই-এ বিরত হলেন না ভগৎ। নিজেকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা তিনি করলেন না। জ্ঞানে ও চিন্তায়, লেখায় ও বলায় অদ্ভুত শক্তিধর ভগৎ বিচারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘ ও অবিস্মরণীয় ভাষণে ব্রিটিশরাজের অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোস খুলে দিলেন; স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে নেমে পড়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। ভগৎ ও বটুক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

জেলের ভিতরেও তাঁরা নিশ্চুপ রইলেন না। শুরু করলেন সংগ্রাম; রাজবন্দিদের উপরে অত্যাচার বন্ধ করার দাবিতে অনশন-সংগ্রাম। নিজেদের কোনো সুখসুবিধা তাঁরা চাননি; চেয়েছিলেন আমরণ সংগ্রাম। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনের অভিযোগ এনে সরকার শুরু করল লাহোর ষড়যন্ত্র মমলা। মামলারও প্রধান আসামি ভগৎ সিং আর অন্যতম আসামি বাংলার বিপ্লবী যতীন দাস। এবার লাহোর মামলার অভিযুক্তরাও যোগ দিলেন অনশনে। নাকে নল পুরে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করলো জেল কর্তৃপক্ষ। বাধা দিতে লাগলেন বন্দিরা। আহত হলেন যতীন দাস; নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তবুও এক ফোঁটা ওষুধ মুখে নিলেন না। লাহোর বন্দিদের এই দুর্জয় সংগ্রামে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল; প্রতিবাদ হতে থাকল বিদেশেও। অবশেষে সরকার নতিস্বীকার করল। দাবি মানার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে অনশন ভঙ্গ হল। ভগৎ-বটুকের অনশন তখন ৮১দিন পেরিয়ে গেছে, অন্যদের অনশন ৫৪ দিন পূর্ণ হয়েছে। অনশন যখন ভঙ্গ হল যতীন দাসের জীবনের আশা তখন তিরোহিত। তবুও অনশনভঙ্গ তিনি করলেন না। বিপ্লবী সহযোদ্ধৃবৃন্দ পরিবৃত যতীন দাস ৬৪ দিন অনশনের পর ব্রিটিশের সমস্ত শক্তিকে পরাস্ত করে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। শবদেহ কলকাতায় আনার পথে প্রতি স্টেশনে অগণিত মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন।

অনশনের জন্য বিচার এতদিন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এবার আবার শুরু হল সেই বিচারের প্রহসন। ভগৎ ও তাঁর সহকর্মিরা প্রতিক্ষণ আইন ও আদালতকে অগ্রাহ্য করার লড়াই চালিয়ে গেলেন। প্রতিদিনের এই লড়াই সারাদেশকে আলোড়িত করতে লাগল। রাজসাক্ষীরা ভেগে পড়তে লাগল। অভিযোগ ফেঁসে যাবার উপক্রম হল। সরকার প্রমাদ গুনল। তারা এক বিশেষ আইন জারি করে বিশেষ আদালতে যথেচ্ছ বিচারের ব্যবস্থা করল। পাঁচ মাস ধরে বিচারের প্রহসন চলার পর ভগৎ এবং তাঁর দুই সহকর্মি রাজগুরু ও সুখদেবের ফাঁসির হুকুম হল। অন্যান্যদের হল কারাদণ্ড। ভারতের যুবসমাজ তখন ভগতের মুখনিঃসৃত 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখর, ভগতের জয়ধ্বনি দিকে-দিগন্তরে। এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ মকুবের দাবি উঠল চতুর্দিকে, লক্ষ লক্ষ আবেদনপত্র গেল, মহাত্মা গান্ধিও আবেদন করলেন। কিন্তু এই দুরন্ত বহ্নিশিখাকে সহ্য করা ব্রিটিশরাজের পক্ষে ছিল অসম্ভব । তাই একদিন রাতে একান্ত গোপনে ভগৎ ও তাঁর দুই সহকর্মিকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমিতে।

পড়ে কী বুঝলে ?

১. লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান দুই আসামি কে ?

২. ফাঁসি কাদের দেওয়া হলো ?

ভগতের শবদেহকেও বিশ্বাস করতে পারল না ব্রিটিশরাজ; গভীর রাতে শতদ্রু নদীর তীরে সকলের অজানিতে তিন জনের দেহ ভস্মীভূত ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পরদিন ঘোষণা করা হল মৃত্যুসংবাদ। ভগতের দেহ ভস্মীভূত হল কিন্তু তাঁর স্মৃতি ও আদর্শ চিরজাগরুক হয়ে রইল।

জেনে রাখো

পঞ্চনদ — ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বিপাশা ও বিতস্থা এই পাঁচটি নদ বয়ে চলেছে পাঞ্জাবের ভেতর দিয়ে তাই পাঞ্জাবকে পঞ্চনদের দেশ বলে।

তুফান — ঝড়

বহ্নিশিখা — আগুনের শিখা

ক্ষোভ — মনস্তাপ

উদ্বেল — উচ্ছলিত

বিক্ষোভ — আলোড়ন

সংযত — নিয়ন্ত্রিত

প্রহসন — হাস্যরসাত্মক নাটক

যাবৎজীবন — সারা জীবন, জীবন পর্যন্ত

বধ্যভূমি — যেখানে বধ করা হয়

দুর্জয় — যা জয় করা শক্ত

দুর্দমণীয় — যা দমন করা যায় না

নির্বাসিত — দেশ থেকে বিতাড়িত করা

লাঞ্ছন — ভৎসনা, দুঃখ দেওয়া

আকাঙ্খা — ইচ্ছা

আত্মোৎসর্গ — নিজের জীবন বিসর্জন (আত্ম - উৎসর্গ)

মকুব — রেহাই

ভস্মীভূত — ছাইয়ে পরিণত

কালিমা — মলিনতা

নতি স্বীকার — হার মানা, পরাভব

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. কোন দেশ ভারতের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করে ভারতকে পরাধীন করে ?
2. ভারত কবে স্বাধীনতা লাভ করে ?
3. ভারতের কয়েকজন প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম লেখো।
4. স্বাধীনতা সংগ্রাম কী ?
5. ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ - কথাটির অর্থ কী ?
6. শতদ্রু নদী কোথায় ?
7. ভগৎ সিং কোথাকার লোক ছিলেন ?
8. ভগৎ সিংকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কিভাবে ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

9. গদর বিপ্লবী বলে কারা পরিচিত ছিল ?
10. স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন এমন কয়েকজনের নাম লেখো ।
11. 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিটি প্রথম কবে ধ্বনিত হয় ?
12. ভগৎ সিং দেশপ্রেমের প্রথম প্রেরণা কোথায় পেয়েছিলেন ?
13. কৃষক আন্দোলনে কারা জড়িয়ে ছিলেন ?

বিস্তারিত লেখো —

14. ভগৎ সিং এর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যা জানো লেখো।
15. দিল্লির আইনসভা আক্রমণ ও তার পরিণতি নিজের ভাষায় লেখো।

16. ভগৎ সিং এর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দাও।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি —

1. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

যুদ্ধায়োজন	রক্তাক্ত
অত্যাচার	অসহযোগ
রোগাক্রান্ত	আত্মোৎসর্গ

2. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পরিবর্তন করো

জাত	দেশ	গ্রাম
পাঞ্জাব	ভারত	বিপ্লব

3. ছক থেকে মিলিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো।

জন	হিত
	বল
	শ্রুতি

অনা	চার
	বৃষ্টি
	আহার

অভি	যোগ
	মান
	রাম

মর্ত্য	লোক
	বাসী
	ভূমি

যেমন — জন + হিত = জনহিত

4. সমাস কাকে বলে? বাংলায় কয় রকম সমাস আছে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও।

আলোচনা করো

স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি যোগ দেননি, অথচ পরোক্ষ ভাবে সৈনিকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহ জানিয়েছেন এমন কোন দেশপ্রেমিকের নাম জানো কী? তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করো।

রাতবিরেতে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মুরারিবাবু খুব বিপদে পড়েছেন। রাত দুপুরে বাড়ির উঠোনে টুপটুপ করে ঢিল পড়ে। কারা ছাদে হেঁটে বেড়ায় ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ। বেরিয়ে কিন্তু কাউকেও দেখতে পান না। টর্চ জ্বেলে বাড়ির চারপাশটা বৃথা খোঁজাখুঁজি করেন। নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। পাড়ার মধ্যেও নয় যে ছেলেরা দুষ্টুমি করবে। তাছাড়া তাজ্জব ব্যাপার, ঢিল পড়ার শব্দ হয় এবং তাঁর টাকেও পড়ে, অথচ ঢিল দেখতে পান না।

পড়ে কী বুঝলে?

১. মুরারিবাবুর বিপদটা কী?

২. মুরারিবাবুর বাড়িটা কেমন জায়গায় ছিল?

৩. অশরীরী কাকে বলা হয়েছে?

তাহলে? এ নিশ্চয় অশরীরীদের কাজ। মুরারিবাবুর বন্ধু ফৈজুদ্দিন এ শহরের নামকরা উকিল। তিনি এসে সব শুনে বললেন, "দেখ মুরারি। আমার মনে হচ্ছে, তুমি জিনের পাল্লায় পড়েছ।"

মুরারিবাবু বললেন, "জিন? সে আবার কী? সবাই তো বলছে এক ভূতেরই কান্ড।"

"উঁহু। ভূত থাকে বনবাদাড়ে, জলার ধরে। নিরিবিলি জায়গায়। পারত পক্ষে তারা মানুষের কাছ ঘেঁষে না। কারণ, মানুষ মরেই তো ভূত হয়। বেঁচে থাকার ঝক্কি কতটা, মানুষ মরার আগে হাড়ে-হাড়ে জেনে যায়। ঘেন্না ধরে যায় মনুষ্যজীবনে। কাজেই মরে ভূত হওয়ার পর কোন পাগল আর মনুষ্যজীবনের আনাচে-কানাচে আসতে চাইবে বলো।"

মুরারিবাবুর মনে ধরল কথাটা। ফৈজুদ্দিন উকিলের যুক্তির প্যাঁচে কত বাঘা-বাঘা হাকিম হার মানেন। মুরারিবাবু বললেন, "হুঁ, হুঁ তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু জিন কী?"

ফৈজুদ্দিন খুশি হয়ে বললেন, "জিনদের ব্যাপারস্যাপার অবিকল ভূতদেরই মতো। তবে তারা একরকম প্রাণী বলতে পারো। তারা মানুষের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। এঁটোকাঁটা, আবর্জনা, গোবর, হাড় এই সব নোংরা জিনিস তাদের খাদ্য। ইচ্ছে করলেই তারা অদৃশ্য হতে পারে। আবার ইচ্ছে করলেই নানারকম রূপ ধরতেও পারে।—

"তারা থাকে কোথায়?"

"পোড়ো বাড়িতে,। চিলেকোঠায় । ছাদে। কখনও বাথরুমের ঘুলঘুলিতে।" ফৈজুদ্দিন চাপা গলায় বললেন। "আমার বাথরুমের ঘুলঘুলিতে একটা জিন ছিল। বুঝলে? রোজ চান করতে ঢুকতুম, আর বেটা মুখ বাড়িয়ে আমায় ভেংচি কাটত। দুটো জুলজুলে নীল চোখ। বাপ্‌স্! এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

মুরারি আঁতকে উঠে বলেন, "দেখতে কেমন জিনটা? খুব ভয়ঙ্কর চেহারা নিশ্চয়?" "তত কিছু না।" ফৈজুদ্দিন কড়ে আঙুল দেখালেন এইটুকুন । একটা টিকটিকির মতো বিদঘুটে।

"তারপর? তারপর? কীভাবে সেটা তাড়ালে?"

"কালা ফকিরকে ডেকে আনলুম। সে ব্যাটাকে আতরের শিশিতে পুরে পুকুরে ফেলে দিয়ে এল। তুমি কালা ফকিরের কেরামতি তো জানো না! তাকে দেখলে জিনেরা লেজ ফেলে রেখে পালায়?"

মুরারির একটু খটকা লাগল। বললেন, "পালায় যদি, শিশিতে পোরে কীভাবে?"

ফৈজুদ্দিন ফ্যাঁচ করে হাসলেন। "সেটাই তো কালা ফকিরের কেরামতি। তুমি এক্ষুনি ওর কাছে যাও। দেখবে ফকিরসায়েব এসে তোমার বাড়ির জিনগুলোকে বস্তায় পুরে সমুদ্দুরে ফেলে দিয়ে আসবে।"

মুরারি লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু ফের খটকা লাগল মনে। বললেন, 'বস্তা কেন? ওই বললে যে আতরের শিশির কথা?"

পড়ে কী বুঝলে?

১. মুরারিবাবুর বন্ধুর নাম কী ছিল?

২. মুরারিবাবুর বিপদের কথা শুনে তার বন্ধু কী বললেন?

৩. ফৈজুদ্দিন পেশাতে কী ছিলেন?

৪. ভীত মুরারিবাবুকে তাঁর বন্ধু কাকে ডাকার কথা বললেন?

"বুঝলে না? তোমার বাড়ির জিন তো ঘুলঘুলির খুদে জিন নয়। একটা-দুটোও নয় - একেবারে এক ঝাঁক। তাছাড়া তারা ভেংচি কাটে না, ঢিল ছোঁড়ে। ছাদ কাঁপিয়ে হেঁটে বেড়ায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, তাদের সাইজ বড়। যাকগে আমার আদালতে যাওয়ার সময় হল। তুমি এক্ষুনি কালা ফকিরের কাছে যাও।"

ফৈজুদ্দিন ব্যস্তভাবে চলে গেলেন । একটু পরে মুরারিবাবুও বেরিয়ে পড়লেন। কালা ফকির থাকে শহরের বাইরে এক নির্জন দরগায়, নিঃঝুম জায়গা। কোনো পীরসায়েবের কবর আছে। ফকির সেই কবরে আগরবাতি আর সাঁঝবাতি জ্বালে। কদাচিৎ ভক্তরা এসে সিন্নি আর দশ-বিশ পয়সা মানত দিয়ে যায়।

মুরারিবাবুকে দেখেই কালা ফকির চোখ পাকিয়ে বলল, "কী? জিনের পাল্লায় পড়েছ বুঝি? ভাগো, এখন আমার যাবার সময় নেই।" কালো আলখেল্লাপরা পাগলাটে চেহারার ফকিরকে দেখে মুরারিবাবু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তার ওপর এই কড়া ধমক। কিন্তু উপায় নেই। খুব ভক্তি দেখিয়ে একটা টাকা ফকিরের পায়ের কাছে রেখে বিনীতভাবে বললেন,

"দয়া করে একবার যেতেই হবে বাবা। রাতে ওদের অত্যাচারে ঘুম হয় না। বড্ড বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে?"

ফকির টাকাটা ভাল করে দেখে নিয়ে আলখেল্লার ভেতরে চালান করে দিল। তারপর বলল, "ঠিক আছে। বাড়ি গিয়ে একটা বস্তা যোগাড় করে রাখো। সব নিশুতি হলে রেতের বেলা যাবখন।"

কালা ফকির সন্ধ্যা গড়িয়ে একটু রাত করে এল। বস্তাটা ভাল করে দেখে নিল ফুটো আছে নাকি। তারপর সেটা নিয়ে একটা অষ্টাবক্র লাঠি নাচাতে নাচাতে সে অন্ধকারে বাড়ির চারদিকে চক্কর দিতে থাকল। বিড়বিড় করে কী সব আওড়াচ্ছিলও। এদিকে মুরারিবাবু তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সে ঘরের ভেতর থাকতে বলেছে। খবর্দার কেউ যেন না বেরোয়। বেরুলে বিপদ।

কতক্ষণ পরে ফকির চেঁচিয়ে ডাকল, "বেরিয়ে এসো সব। কেল্লা ফতে। সবকো পাকাড় লিয়া।"

সবাই বেরিয়ে গিয়ে দেখল, কালা ফকির বস্তার মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর সেই বাঁকাচোরা লাঠিটা দমাদ্দম চালাচ্ছে। "বল! আর জ্বালাবি? বল, কখনো ঢিল ছুড়বি?"

মুরারিবাবুর স্ত্রী নরম মনের মানুষ। কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, "ওগো! ফকিরসায়েবকে বারণ করো! আহা, অত করে বেচারাদের মারে না! মরে যাবে যে!"

ফকির একগাল হেসে বলল, "ঠিক আছে। মা-ঠাকরুন বলছে যখন । তো কই, রাহাখরচ দাও। সমুদ্দুরে ফেলতে যাব। সমুদ্দুর কি এখানে? তের নদীর পারে। ট্রেনে বাসে জাহাজে কতবার চাপতে হবে তবে না।"

রাহাখরচ নিয়ে ফকির চলে গেল । বস্তা কাঁধে নিয়েই গেল। মুরারিবাবুর বড় মেয়ে বিলু চোখ বড় করে বলল, "বাবা, বাবা! বস্তার ভেতর কেমন একটা শব্দ হচ্ছিল শুনেছ?"

তার মা বললেন, "চুপ, চুপ। বলতে নেই।"

আজ সবাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে আরও রাত হল। বাড়ি নিরাপদ। তাই উঠোনে মুরারিবাবু মহানন্দে পায়চারি করতে থাকলেন। গল্পগুজবও করলেন নানারকম। সব নিশুতি নিঃঝুম হয়ে গেছে । ঝিঁঝি ডাকছে। জোনাকি জ্বলছে গাছপালায়। সেই সময় রাত বারোটা পাঁচের ডাউন ট্রেন শিস দিতে দিতে আসছে । রেল লাইন বাড়ির ওপাশ দিয়ে গেছে। বাড়ি থেকেও দেখা যায়। ট্রেনের আলো ঝলসে দিয়ে যায় বাড়িটাকে। বিলুর ভাই অমু বলল, "বাবা, ফকির এই ট্রেনেই যাচ্ছে।"

মুরারিবাবু বললেন, "হ্যাঁ। বে অফ বেঙ্গল যেতে হলে...."

হঠাৎ তাঁর কথা থেমে গেল। লাফিয়ে উঠলেন। এ কী! ফের তাঁর মাথায় ঢিল পড়ল যে? শুধু তাই নয়, কালো-কালো আরও ঢিল উঠোনে তার আশেপাশে টুপটুপ করে পড়ছে। ট্রেনের আলোটা সোজা এসে পড়েছে তাঁর গায়ে। মুরারিবাবু আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। মুখে কথা নেই। ট্রেন চলে গেলে ঝলসানো আলোটাও সরল। তখন মুরারির মুখে কথা এল। - "ঘরে ঢোকো! ঘরে ঢোকো!" বলে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠলেন।

তারপর রাগে দুঃখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে বলেন, "ব্যাটা ভন্ড ফকির স্রেফ ঠকিয়ে গেল! ওঃ কী ভুল না করেছি!"

বিলুর মা বলেন, "সে কী! কেন কেন ও-কথা বলছ?"

"এইমাত্র ঢিল পড়ল দেখলে না! আমার মাথাতেও পড়ল!" মুরারি টাকে হাত বুলোতে গিয়ে ফের লাফিয়ে উঠলেন। "ওরে বাবা! আমার কানের পাশে কী যেন রয়েছে! ঢিল ভুতুড়ে ঢিল আটকে রয়েছে।"

অমু বাবার কানের পাশ থেকে কালো কী একটা খপ করে ধরে ফেলল। তারপর বলল, "ও বাবা! এটা তো চামচিকে!"

"অ্যাঁ! মুরারি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। অমু চামচিকেটা ছেড়ে দিতেই থামের গায়ে আটকে গেল। কিন্তু বলা যায় না, জিনেরা কতরকম রূপ ধরে! তাই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। "মার, মার! জুতোপেটা কর!"

সেই সময় বলে উঠল, "বাবা, ইউরেকা!"

"ইউরেকা মানে?"

অমু রহস্যভেদী গোয়েন্দার মতো ভারিক্কি চালে বলল, "মাত্র চামচিকে। স্রেফ চামচিকে বাবা! বুঝলে না? ট্রেনের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত চামচিকেগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর টুপটুপ করে পড়তে থাকে! আমরা ভাবি ঢিল পড়ছে!"

মুরারিবাবু সন্দিগ্ধভাবে বললেন, "কিন্তু ছাদের ধুপধুপ শব্দ?"

অমু তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল, "শব্দ হোক না। আমি ছাদে যাব"।

তার মা বললেন, "ওরে না, না! যাসনে অমু। ওই শোন, কারা হেঁটে বেড়াচ্ছে! ওগো, কাল বরং ওঝা ডেকে আনো। মনে হচ্ছে ওরা জিনটিন নয়, অন্য কিছু।"

মুরারি সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। ভূতই বটে। কালই হরিপদ ওঝার বাড়ি যাব।"

ওদিকে তক্ষুনি অমু ছাদে চলে গেছে টর্চ নিয়ে। ছাদ থেকে তার গলা শোনা গেল। 'বাবা, মা ইউরেকা, এগেন ইউরেকা!"

এঁরা সবাই উঠোনে নামলেন ভয়ে-ভয়ে। কী দস্যি ছেলেরে বাবা! মুরারি বললেন "কী রে?"

"ছুঁচো বাবা।"

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ বাবা! আর কিছু না-স্রেফ ছুঁচো। ডন টেনে বেড়াচ্ছে। দেখবে এসো!"

মুরারী নিশ্বাস ফেলে বললেন, "হুঁ। নেমে আয়।"

ছাদে রাজ্যের আবর্জনা জমে আছে। পুরনো বাইন। ছুঁচোর আড্ডা হতেই পারে। রাতবিরেতে একদঙ্গল ছুঁচো ছাদে ডন টানে। কেওনও গায় নেচে-নেচে। তাই শব্দ হয়। বাড়িটা এবার মেরামতি করে কলি ফেরানো দরকার। চামচিকে, ছুঁচো, ইঁদুর, আরশোলা, টিকটিকির আড্ডা হয়ে গেছে।

পড়ে কী বুঝলে?

১. কালা ফকির কোথায় থাকে?

২. "ফেরিয়ে এসো সব। কেল্লাফতে। সবকো পাকড় লিয়া"। কথাটি কে বলেছে? কাদের বেরিয়ে আসতে বলল?

৩. অমু তার বাবার কানের পাশ থেকে কী ধরলো?

□□□

জেনে রাখো

অশরীরী — দেহহীন, নিরাকার (নাই শরীর যার)
জিন — দৈত্য (আরবী শব্দ), ভূত (ঘোড়ার পিঠে বসার আসন (ফারসীতে), মোটা সুতায় বোনা কাপড় (ইংরাজীতে)
নিরিবিলি — যেখানে কেউ থাকেনা
তাজ্জব — অবাক
পারত পক্ষে — পারলে, সম্ভব হলে
অবিকল — হুবহু
অষ্টবক্র — অষ্টাবক্র একজন ঋষির নাম। যাঁর আটটা অঙ্গ বাঁকা। এখানে বাঁকাটেরা লাঠি বোঝাতে অষ্টাবক্র লাঠি বলা হয়েছে।
ইউরেকা — আমি পেলাম (গ্রীক শব্দ, বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের বিখ্যাত উক্তি)
বিদঘুটে — কুৎসিত, বিশ্রী
আতর — সুগন্ধি
পীর — মুসলমান সাধু
সিন্নি — মুসলমান প্রসাদকে সিন্নি বলে। হিন্দুদের পূজায় সত্যনারায়ণকে দুধ, আটা, গুড়, কলা ইত্যাদি দিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়, তাকেও সিন্নি বলো। (মূল ফারসী শব্দ শিরনি)
নিশুতি — গভীর রাত্রি
কেল্লাফতে — জিতে যাওয়া।
কলি ফেরানো — চুনকাম করানো।

পাঠ পরিচয়

মানুষের দুর্বল মনে নানা ধরনের কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস বাসা বাঁধে। এগুলি দিন দিন বেড়ে যায়, কোন যুক্তি মানতে চায় না। একটা অজানা ভয় মনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে। 'রাতবিরেতে' গল্পটিতে মুরারিবাবু ও তার স্ত্রী এমনই এক অজানা ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। তার বন্ধু ফৈজুদ্দিন একই মনোভাবের মানুষ। মুরারিবাবুর বাড়িতে কোন এক বিশেষ সময়ে ঢিল পড়ে অথচ কিছুক্ষণ পরে ঢিল দেখতে পান না ছাদে নানা ধরনের শব্দ হয়। এই কাজগুলির পেছনে যে কারণ আছে মুরারিবাবু তা খোঁজার চেষ্টা না করে ভূতের ভয়ে ওঝা, ফকিরের দ্বারস্থ হন। বাড়ির ছোট ছেলেটির সামান্য সাহস মিথ্যে ভয়ের হাত থেকে সবাইকে মুক্তি দেয়। লেখক গল্পের মাধ্যমে কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ মানুষকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন।

পাঠবোধ

খালি জায়গায় ঠিক উত্তরটি লেখো —

1. "দেখ মুরারি, আমার মনে হচ্ছে তুমি ..... পাল্লায় পড়েছ।" (জিনের / পাগলের)
2. অমু বলল, "বাবা ফকির এই .....যাচ্ছে"। (বাসেই / ট্রেনে)
3. 'ব্যাটা ভন্ড ফকির স্রেফ ..... গেল।" (গালদিয়ে / ঠকিয়ে)
4. অমু বলল, "ও বাবা! এটা তো ..... ! (ইঁদুর / চামচিকে)
5. মুরারি চেঁচিয়ে উঠলেন, "মার মার..... কর"। (লাঠিপেটা / জুতো পেটা)

সংক্ষেপে উত্তর দাও

6. কালা ফকির কোথায় থাকে আর কী করে?
7. 'ইউরেকা' শব্দটির অর্থ কী? কোন দেশের শব্দ?
8. মুরারিবাবু বললেন "হ্যাঁ। বে অফ বেঙ্গল যেতে হলে ..." বলেই থেমে গেলেন আর লাফিয়ে উঠলেন, কেন?
9. উড়ন্ত চামচিকেগুলো কেন টুপটুপ করে পড়তে থাকে?

বিস্তারিতভাবে লেখো

10. মুরারিবাবু কোন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন ? তাঁর বন্ধু এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে কী উপদেশ দিলেন ?
11. মুরারিবাবু বাড়িতে কালা ফকির এসে কী কী করল ? বিস্তারিতভাবে লেখো।
12. ঢিল পড়া ও ছাদে ধুপধাপ শব্দের রহস্য ছোট্ট ছেলে অমু কীভাবে অতি সহজে সমাধান করলো ? বিস্তারিতভাবে লেখো।

1. নিচের বাক্যগুলিতে দাগ দেওয়া শব্দের কারক লেখো —

   ক) ভূত থাকে বনবাদাড়ে।

   খ) ফৈজুদ্দিন ব্যস্তভাবে চলে গেলেন।

   গ) ফকির বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এলো।

   ঘ) মুরারিবাবু ফকিরকে রাহা খরচ দিয়ে দিলেন।

   ঙ) ট্রেনের আলোটা সোজা এসে পড়েছে তার গায়ে।

   চ) ওঝাকে ডেকে আনো।

   ছ) কালা ফকির বাঁকাচোরা লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো।

2. সন্ধি করো

নিঃ + চয়	অষ্ট + বক্র
নিঃ + জন	নিঃ + চিন্ত
অতি + আচার	নিঃ + রব

3. নিচের প্রবাদ বাক্যগুলির অর্থ লেখো।

   চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

   বরের পিসি কনের মাসি ।

   গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

   মরণ কালে হরিনাম ।

4. সর্বনাম গুলির বহুবচনের রূপ লেখো

সে	—	ওর	—
আমি	—	আমার	—
তুমি	—	তোমার	—

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা সম্পর্কে তোমরা আগে জেনেছ নিশ্চয়ই জানো ১) সাধু ভাষায় তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি হয়, চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বেশি, তৎসম শব্দের ব্যবহার কম।

২) ক্রিয়াপদ সাধু ভাষায় পূর্ণরূপে ব্যবহার হয়, যেমন — করিতেছে, করিয়া ইত্যাদি । কিন্তু চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা যায়। যেমন, করছে, করে ইত্যাদি।

৩) সর্বনামের সাধুভাষায় পূর্ণরূপ, যেমন — তাহারা, যাহাদের,। চলিত ভাষায় এর সংক্ষিপ্ত ব্যবহার, যেমন — তারা, যাদের । ৪) সাধুভাষায় সন্ধি ও সমাস বেশি ব্যবহার হয়, চলিতে এর প্রয়োগ কম । ৫) চলিত ভাষায় লেখা বা বলার

ভঙ্গিও সাধু ভাষার থেকে কিছুটা আলাদা।

5. নিচের সাধু ভাষায় লেখা অংশটি চলিত ভাষায় লেখো —

কালো আলখাল্লা পড়া পাগলাটে চেহারার ফকিরকে দেখিয়া মুরারিবাবু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। তাহার উপর এই কড়া ধমক। কিন্তু উপায় নাই। খুব ভক্তি দেখাইয়া একটি টাকা ফকিরের পায়ের নিকট রাখিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, 'দয়া করিয়া একবার যাইতেই হইবে বাবা,।"

6. দেখা এবং বোঝার ভুলে অধিকাংশ লোক অন্ধকারে ভয়ে ভূতের কল্পনা করে থাকে। বাস্তবে ভূতের কোন অস্তিত্ব নেই। গল্পটি (রাত বিরেতে) পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছ। তোমাদের জানা এ ধরনের কোন ঘটনার বর্ণনা করো।

করতে পারো

1. পাড়া প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই এই ধরনের অলীক (মিথ্যা) ঘটনায় ভীত হয়ে পড়ে, তোমরা বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে তাদের ভয় ভাঙ্গাবার চেষ্টা কর।

2. ভয় বা কুসংস্কার কতটা ক্ষতির কারণ হয়, বিশেষ করে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে "পাশের পড়া' কবিতাটি পড়ে নিশ্চই বুঝতে পেরেছো।

বনপথে জ্যোৎস্না রূপ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। এখনই রওনা হওয়া দরকার, ব্রহ্মা মাহাতোকে সে কথা বলিয়া বিদায় চাহিলাম। ব্রহ্মা মাহাতো তো একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, তাঁবুতে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহার হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। অসম্ভব! এই ত্রিশ মাইল রাস্তা অবেলায় ফেরা! হুজুর কলিকাতার মানুষ, এ অঞ্চলের পথের খবর জানা নাই তাই একথা বলিতেছেন। দশ মাইল যাইতে সূর্য যাইবে ডুবিয়া, না হয় জ্যোৎস্নারাত্রিই হইল, ঘন পাহাড়-জঙ্গলের পথ, মানুষ-জন কোথাও নাই, বাঘ বাহির হইতে পারে, বুনো মহিষ আছে, বিশেষত পাকা কুলের সময়, এখন ভালুক তো নিশ্চয়ই বাহির হইবে, কারো নদীর ওপারে মহালিখারূপের জঙ্গলে এই তো সেদিনও এক গরুর গাড়ির গারোয়ানকে বাঘে লইয়াছে। বেচারী জঙ্গলের পথে একা গাড়ী চালাইয়া আসিতেছিল। অসম্ভব, হুজুর। রাত্রে এখানে থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, যখন দয়াকরিয়া আসিয়েছেন গরীবের ডেরায়, কাল সকালে তখন ধীরে-সুস্থে গেলেই হইবে।

এ বাসন্তী পূর্ণিমায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে জনহীন পাহাড় জঙ্গলের পথে একা ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার প্রলোভন আমার কাছে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। জীবনে আর কখনও হইবে না, এই হয়ত শেষ, আর যে অপূর্ব বন-পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি পথে। জ্যোৎস্নারাত্রে-বিশেষত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাহাদের রূপ একবার দেখিব না যদি, তবে এতটা কষ্ট করিয়া আসিবার কী অর্থ হয়?

সকালের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া রওনা হইলাম, ব্রহ্মা মাহাতো ঠিকই বলিয়াছিল, কারো নদীতে পৌঁছিবার কিছু পূর্বেই টক্‌টকে লাল সুবৃহৎ সূর্যটা পশ্চিম দিনচক্রবালে একটা অনুচ্চ শৈলমালার পিছনে অস্ত গেল। কারো নদীর তীরে বালিয়াড়ির উপর যখন ঘোড়াসুদ্ধ উঠিয়াছি, এইবার এখান হইতে ঢালু বালির পথে নদীগর্ভে নামিব—হঠাৎ সেই সূর্যাস্তের দৃশ্য এবং ঠিক পূর্বে বহু দূরে কৃষ্ণ রেখার মত পরিদৃশ্যমান মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মাথায় নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের দৃশ্য-যুগপৎ এই অস্ত ও উদয়ের দৃশ্যে থমকিয়া ঘোড়াকে লাগাম কষিয়া দাঁড় করাইলাম। সেই নির্জন অপরিচিত নদীতীরে সমস্তই যেন একটা অবাস্তব ব্যাপারের মত দেখাইতেছে—

পথে সর্বত্র পাহাড়ের ঢালুতে ও ডাঙায় ছাড়া-ছাড়া জঙ্গল, মাঝে মাঝে সরু পথটাকে যেন দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার কোথাও কিছুদূরে সরিয়া যাইতেছে। কি ভয়ঙ্কর নির্জন চারিদিক, দিনমানে যা-হয় একরূপ ছিল, জ্যোৎস্না উঠিবার পর মনে হইতেছে যেন অজানা ও অদ্ভুত সৌন্দর্যময় পরীরাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ভয়ও হইল, মনে পড়িল মেলায় ব্রহ্মা মাহাতো এবং কাছারিতে প্রায় সকলেই রাত্রে এপথে একা আসিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিল, মনে পড়িল নন্দকিশোর গোসাঁই নামে আমাদের একজন বাথানদার প্রজা আজ মাস দুই-তিন আগে কাছারিতে বসিয়া গল্প করিয়াছিল এই মহালিখারূপের জঙ্গলে সেই সময় কাহাকে বাঘে খাওয়ার ব্যাপার। জঙ্গলের এখানে-ওখানে

বড় বড় কুলগাছে কুল পাকিয়া ডাল নত হইয়া আছে—তলায় বিস্তর শুকনো ও পাকা কুল ছড়ানো—সুতরাং ভালুক বাহির হইবারও সম্ভাবনা খুবই। বুনো মহিষ ও বনে না থাকিলেও মোহনপুরা জঙ্গল হইতে ওবেলার মত এক-আধটা ছিটকাইয়া আসিতে কতক্ষণ! সম্মুখে এখনও পনের মাইল নির্জন বনপ্রান্তরের উপর দিয়া পথ।

পড়ে কী বুঝলে?

১. লেখক কার কাছ থেকে বিদায় চাইলেন?

২. জ্যোৎস্নারাত্রে জঙ্গলের পথে লেখকের কিসে চড়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয়?

৩. জঙ্গলে কোন ফলের গাছ বেশি দেখা যায়?

ভয়ের অনুভূতি চারিপাশের সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক এক স্থানে পথ দক্ষিণ হইতে খাড়া উত্তরে ও উত্তর হইতে পূর্বে ঘুরিয়া গিয়াছে, পথের খুব কাছে বাম দিকে সর্বত্রই একটানা অনুচ্চ শৈলমালা, তাদের ঢালুতে গোলগোলি ও পলাশের জঙ্গল, উপরের দিকে শাল ও বড় বড় ঘাস। জ্যোৎস্না এবার ফুটফুট করিতেছে, গাছের ছায়া হ্রস্বতম হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বন্য- ফুলের সুবাসে জ্যোৎস্নাশুভ্র প্রান্তর ভরপুর, অনেক দূরে পাহাড়ে সাঁওতালেরা জুম চাষের জন্য আগুন দিয়াছে, সে কি অভিনব দৃশ্য, মনে হইতেছে পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে।

কখনও যদি এসব দিকে না আসিতাম, কেহ বলিলেও বিশ্বাস করিতাম না যে, বাংলা দেশের এত নিকটেই এরূপ সম্পূর্ণ জনহীন অরণ্যপ্রান্তর ও শৈলমালা আছে, যাহা সৌন্দর্যে আরিজোনার, পাথুরে মরুদেশ বা রোডিসিয়ার বুশভেল্ডের অপেক্ষা কম নয় কোনো অংশে — বিপদের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এসব অঞ্চল নিতান্ত পুতুপুতু বলা চলে না, সন্ধ্যার পরেই যেখানে বাঘ-ভালুকের ভয়ে লোকে পথ হাঁটে না।

এই মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলাম, এ এক আলাদা জীবন, যারা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে না, সংসার করা যাদের রক্তে নাই, সেই সব বারমুখো, খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষের পক্ষে এমন জীবনই তো কাম্য। কলিকাতা হইতে প্রথম প্রথম আসিয়া এখানকার এই ভীষণ নির্জনতা ও সম্পূর্ণ বন্য জীবনযাত্রা কি অসহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই ভাল, এই বর্বর রুক্ষ বন্য প্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কী? এই পথহীন প্রান্তরের শিলাখন্ড ও শালপলাশের বনের মধ্যে দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশতলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু-হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোনো সম্পদ বিনিময় করিতে চাহি না।

পড়ে কী বুঝলে?

১. সাঁওতালেরা কোন চাষের জন্য আগুন দিয়েছিল? তার অভিনব দৃশ্য কেমন ছিল?

২. সন্ধ্যার পরে কিসের ভয়ে লোকে পথে হাঁটে না?

৩. কোন আনন্দের সঙ্গে লেখক দুনিয়ার কোন আনন্দ বিনিময় করতে চান না?

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু, বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয়রেখা যাদের কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোনো কালেই।

মহালিখারূপের জঙ্গল শেষ হইতেই মাইল চার গিয়া আমাদের সীমানা শুরু হইল। রাত প্রায় নটার সময়ে কাছারি পৌঁছিলাম।

□□□

জেনে রাখো

অসম্ভব	—	যেটা সম্ভব নয়	অপরিচিত	—	অজানা
অঞ্চল	—	এলাকা	অবাস্তব	—	যেটা বাস্তবিক নয়
পরিপূর্ণ	—	সম্পূর্ণ	ভয়ঙ্কর	—	বিকট
প্রলোভন	—	লোভ	নিষেধ	—	বারণ করা
দুর্দমনীয়	—	যা দমন করা যায় না	বনপ্রান্ত	—	বনের পাশ দিয়ে
সনির্বন্ধ	—	অতিশয় আগ্রহযুক্ত	অনুভূতি	—	উপলব্ধি, বোধ।
সুবৃহৎ	—	খুব বড়	অনুচ্চ	—	খুব উঁচু নয়
শৈলমালা	—	পাহাড়ের সারি	হ্রস্বতম	—	সবেচেয়ে ছোট
জুম চাষ	—	পাহাড়ের গায়ে যে চাষ হয় তাকে জুম চাষ বলে।	দিগন্তব্যাপী	—	অনেক দূর পর্যন্ত

লেখক পরিচয় —

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক। তাঁর বাল্যকাল ও শৈশব জীবন অতিবাহিত হয় দারিদ্র্য, অভাব, অনটনের মধ্যে। জীবনের বেশির ভাগ অংশ শিক্ষকতা করে কাটিয়েছেন। মাঝে খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে সেক্রেটারি ছিলেন । সেখানে গৃহশিক্ষকতাও করেছেন। পরে তাদেরই এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে ভাগলপুরে কয়েক বছর ছিলেন। শৈশব থেকেই প্রকৃতির প্রতি ছিল তাঁর নিবিড় আকর্ষণ। তাঁর গল্প উপন্যাসে অপরূপ প্রকৃতি ভাবনার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। প্রথম প্রকাশিত রচনা 'উপেক্ষিতা' নামে একটি গল্প ১৯২২ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। মাত্র ২১ বছরের সাহিত্যজীবনে তিনি অজস্র ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, দিনপিপি, ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন। অপরাজিত। পথের পাঁচালি, দৃষ্টি প্রদীপ, আরণ্যক, ইছামতী প্রমুখ উপন্যাস ছাড়াও শিশু বা কিশোর সাহিত্য রচনায় লেখক অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর চাঁদের পাহাড়, মরনের ডঙ্কা বাজে, হীরামানিক জ্বলে প্রভৃতি কিশোর সাহিত্য কালজয়ী হয়েছে। পথের পাঁচালি ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯৫১ সালে ইছামতী উপন্যাসের জন্য (মরণোত্তর) রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

পাঠবোধ

1. ঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন আর ভুল উত্তরে (✗) চিহ্ন দাও।
   (ক) লেখক কর্মস্থল থেকে যে পথে ফিরছিলেন সে পথ ছিল বিপদসঙ্কুল।
   (খ) জঙ্গলের পথ লেখকের কাছে অজানা ছিল না।
   (গ) লেখক কারো নদীতে যখন পৌঁছালেন তখন সূর্য অস্ত গেল।
   (ঘ) নির্জন জঙ্গল পথে চলাকালে লেখক একটুও ভয় পাননি।
   (ঙ) বন পথে জ্যোৎস্না লেখককে রোমাঞ্চিত করেছিল।

অতি সংক্ষেপে উত্তর লেখো :

2. কোন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লেখক কাছারিতে ফিরছিলেন?
3. অবেলায় ফিরতে লেখককে নিষেধ করা হয়েছিল কেন?
4. লেখক নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাতেই কাছারিতে ফিরতে কেন চেয়েছিলেন?
5. লেখকের মনে কেন ভয়ের বোধ হলো?
6. লেখক সেই জ্যোৎস্না রাতে পাহাড়ে পাহাড়ে কী দেখেছিলেন?

সংক্ষেপে উত্তর লেখো :

7. লেখক ফেরার কথা বললে সকলে তাঁর কথায় হাঁ করে চেয়েছিল কেন?
8. ভয়ের অনুভূতিতে লেখকের মনে কী বোধ হয়েছিল ?
9. 'সে কি অভিনব দৃশ্য' কোন অভিনব দৃশ্যের কথা এখানে বলা হয়েছে?
10. জঙ্গলের পথে একা ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার ইচ্ছা লেখকের কেন হয়েছিল?
11. জ্যোৎস্না উঠলে বনভূমিকে লেখকের পরীরাজ্য বলে কেন মনে হয়েছিল?

বিস্তারিতভাবে লেখো :

12. 'সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া রওনা হইলাম'— কে একথা বলেছেন? কার অনুরোধ না মেনে কেন আর কোথায় তিনি রওনা হলেন?
13. কাছারি থেকে ফেরার পথে জঙ্গলে পূর্ণিমা রাতের সে প্রাকৃতিক দৃশ্য লেখককে কেমনভাবে মুগ্ধ করেছিল, তা নিজের ভাষায় লেখো।
14. "এ স্বপ্নভূমি ———"

    (ক) এটি কোন রচনার অংশ?

    (খ) রচনাটির লেখকের নাম কী?

    (গ) লেখক কাকে স্বপ্নভূমি বলেছেন?

    (ঘ) তাকে স্বপ্নভূমি বলার কারণ কী? বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি :-

1. নিচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো —

    অপার্থিব

    হাতছানি

    বারমুখো

    খাপছাড়া

    স্বপ্নভূমি

    উদ্ভাসিত

2. বিপরীত শব্দ লেখো :-

    অসম্ভব ——

    অবেলা ——

    ভরপুর ——

    জনহীন ——

    মুক্ত ——

    পূর্ণিমা ——

3. এক কথায় প্রকাশ করো :-

    গাড়ি চালায় যে —

    নতুন উদয় হয়েছে যে —

যাকে দমন করা যায় না —

যে পরিচিত নয় —

যে অল্প কথা বলে —

যিনি ব্যাকরণ জানেন —

4. নিচে একই উচ্চারণ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দুটি করে শব্দ দেওয়া হলো।—এগুলির আলাদা আলাদা অর্থ লেখো।

কাঁদা	দীপ
কাদা	দ্বীপ
সূত	চিত্র
সূত	চিত্ত
বিশ	টিকা
বিষ	টীকা

5. নিচে দেওয়া শব্দগুলি মধ্যে ঠিক শব্দে (✓) চিহ্ন দাও

ক) সাহায্য, সাহাজ্য, সাহার্য ।

খ) স্বরস্বতী, সরস্বতী, স্বরসতী ।

গ) হৃষিকেশ, হৃষীকেস, হৃষিকেস

ঘ) শ্রীচরণেসু, শ্রীচরণেষু, শ্রীচরনেষু

জেনে নাও —

'বনপথে জ্যোৎস্নার রূপ' পাঠটি বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের অংশবিশেষ। প্রকৃতি প্রেমিক লেখক এখানে প্রকৃতির এক অসাধারণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

জ্বলন্ত চোখ

সঙ্কর্ষণ রায়

এম.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে বসে আছি। এমন সময় গিরিডি থেকে আমার বন্ধু প্রবীরের বাবা রণবীর বাবুর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। গিরিডির কাছে তাঁর অভ্রের খনি আছে।প্রবীর আমার সঙ্গে এম.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েই খনির কাজকর্ম দেখাশুনা করতে শুরু করেছে।

রণবীর বাবু লিখেছেন ঃ

'খুব বিপদের মধ্যে আছি। এই চিঠি পাওয়া মাত্র চলে এস।'

গেলাম গিরিডি। গিরিডিতে উশ্রী নদীর ধারে রণবীর বাবুর বাড়ি। বাড়ির চারপাশে দশ বিঘা জমি জুড়ে ফুল ও ফলের বাগান। রকমারি ফুল ও পাতার সমাবেশ নানা রঙের বর্ণালি সৃষ্টি করেছে। বাগানে এত রঙ সত্ত্বেও রণবীর বাবুর মুখ ফ্যাকাশে ও বিবর্ণ। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে কাকাবাবু?' 'না।' তিনি জবাব দিলেন 'শরীর ঠিকই আছে, তবে মনটা বিগড়ে আছে। আমার ঘরে এস, সব কথা খুলে বলছি...'

আমাকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন তিনি। তারপর বললেন, 'প্রবীরকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়েছি। একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছে সে।'

'বাজে লোক!' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'প্রবীরের মত ছেলে কখনো বাজে লোকের পাল্লায় পড়তে পারে বলে মনে হয় না...'।

'পড়েছে। ডক্টর অধীর দে'র নাম শুনেছ তো?'

'ডক্টর অধীর দে তো একজন বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী!' আমার চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে ঃ 'তাঁকে আপনি বাজে লোক বলছেন!'

'বলছি বইকি।' রণবীর বাবু জোর দিয়ে বলেন, 'একশো বার বলব। আমেরিকার কোন্ এক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসার ছিলেন, প্রফেসারি ছেড়ে চলে এসেছেন দেশে। এসেই ভর করেছেন প্রবীরের ওপরে...'

'ডক্টর অধীর দে'র মত বৈজ্ঞানিকের সাহচর্যে আসা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার! তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রবীরকে উপকৃতই করবে...'

'উপকৃত নয়, সর্বনাশ করবে, ধনেপ্রাণে ঘায়েল করবে তাকে, সেই সঙ্গে আমাকেও...'

পড়ে কী বুঝলে?

১. 'জ্বলন্ত চোখ' গল্পে লেখক কোন্ পরীক্ষা দিয়ে বসে থাকার কথা বলেছেন?

২. গিরিডিতে কে গিয়েছিলেন?

৩. ডঃ অধীর দে কে ছিলেন?

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না!' আমি হতবুদ্ধির মত তাকালাম তাঁর মুখের দিকে।

আমার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, 'প্রবীরের বন্ধু তুমি, তুমি নিশ্চয়ই তার ভাল চাও?'

'চাই বই কি...সেজন্যই তো বলছিলাম...'

'যদি সত্যিই ওর হিতাকাঙ্ক্ষী হও, ওকে অধীর দে'র রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত কর। জান, অধীর দে ওর কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা শুষে নিচ্ছে আমার অভ্রখনির মধ্যে নতুন একটা খনিজ খুঁজে বের করার নাম ক'রে।

'নতুন খনিজ! কি সেই বস্তু?' আমি প্রশ্ন করি।

'জানি না।' রণবীর বাবু জবাব দিলেন, 'শুধু এইটুকু জানি যে, যে টাকা প্রবীর ঢালছে, তার এক পয়সাও ফিরে আসবে না। আমার ধারণা, এই খনিজের ব্যাপারটা পুরোপুরি ভুয়ো, অধীর দে ভাঁওতা দিয়ে টাকা আদায় করে নিচ্ছেন প্রবীরের কাছ থেকে...'

'অধীর দে'র মত বিজ্ঞানী ভাঁওতা দিয়ে কারুর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবেন, এ যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না...'

'অবিশ্বাস্য হলেও এ সত্যি—মানে আমি মনে করি এ সত্যি। আমার অনুরোধ, ব্যাপারটার খোঁজখবর নাও তুমি...উদ্ধার কর প্রবীরকে অধীরের খপ্পর থেকে...'

'আপনি নিজে প্রবীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন...'

'করেছি, কিন্তু তার কাছ থেকে কোন জবাব পাই নি। সে শুধু বলছে, ব্যাপারটা একান্তভাবে গোপনীয়।'

'ঠিক আছে, আমি নিজে তাকে প্রশ্ন করব...'

কিন্তু প্রশ্ন ক'রে কোন উত্তর পাই না। প্রবীর বললে, 'গিরিডি বেড়াতে এসেছ, আমাদের একটা গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি সেই গাড়ি ক'রে যত খুশি ঘরে বেড়াও, কিন্তু আমার এই ব্যাপারে এখন নাক গলাতে এস না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, এ ব্যাপারে নাক গলাব না । তবে একটা অনুরোধ, ডক্টর অধীর দে'র সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও...'

'অসম্ভব।' কঠোর হয়ে ওঠে প্রবীরের মুখের ভাব ঃ 'যতই অধীর হও, অধীর দে'র সঙ্গে তোমার আলাপ আপাততঃ সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে তিনি খুবই ব্যস্ত আছেন, তাঁর জন্য একটা ল্যাবোরেটারি গড়ে তুলেছি, সেখানে দিনরাত কাজ করছেন তিনি...'

ল্যাবোরেটারিটা রয়েছে রণবীর বাবুর বাড়ির পেছনে বাগানের পেছনদিকের পাঁচিল ঘেঁষে। ডক্টর অধীর দে এই ল্যাবোরেটারির মধ্যে কাজ করছেন, অতএব গোপনে, অর্থাৎ প্রবীরের চোখে ধূলো দিয়ে ল্যাবোরেটারির মধ্যে ঢুকব ঠিক করলাম। ল্যাবোরেটারির মধ্যে ঢুকে ডক্টর দে'র মুখোমুখি হতে পারলে প্রয়োজনীয় খবরাখবর তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারব বলে আমার মনে হ'ল।

একদিন রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে ল্যাবোরেটারির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ল্যাবোরেটারির দরজা তালা দিয়ে বন্ধ করা আছে। বুঝতে পারি যে ডক্টর দে বা প্রবীর কেউই ল্যাবোরেটারির মধ্যে নেই। মনে মনে দমে গিয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছি, এমন সময় আমার মাথায় একটা মতলব খেলে যায়। ল্যাবোরেটারিতে অধীর দে বা প্রবীর কেউই যখন নেই, তখন তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারি। ভেতরে ঢুকে অধীর দে'র কার্যকলাপের আভাস পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু ভেতরে ঢোকার পথ বন্ধ, তালা ভেঙ্গে ঢোকার সাধ্য নেই, এ হেন অবস্থায় বিকল্প কি কৌশল অবলম্বন করা

যেতে পারে তা ভাবতে থাকি।

ভাবতে ভাবতে ল্যাবোরেটারির পেছন দিকে যাই। পেছনে ঘন ঘাসের জঙ্গল। মানুষের সমান উঁচু ঘাস পাঁচিল ও ল্যাবোরেটারির দেয়ালের মাঝখানকার জমিকে ঢেকে রেখেছে।

পা টিপে টিপে ঘাসবনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাই। অনেক কষ্টে ঘাসের বেষ্টনী করে ল্যাবোরেটারির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াই। ততক্ষণে অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠে ঘাসবন ও চারপাশের বাগানকে একাকার করে দিয়েছে। এমনি গভীর আঁধারে কেউ দেখতে পাবে না আমাকে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যা খুশি তা করার এমন সুবর্ণসুযোগ আর কখনো পাব বলে মনে হয় না।

ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, ন-দশ ফুট ওপরেই ল্যাবোরেটারির টালির ছাদ। দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠে টালি সরিয়ে ল্যাবোরেটারির মধ্যে ঢোকার পথ পেয়ে যেতে পারি।

পকেট থেকে টর্চ বের করে টর্চের আলোয় দেয়ালটা পরীক্ষা করি। ফাটল-ধরা দেয়াল অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছে। ভাঙ্গনের পথ বেয়ে উঠতে থাকি ওপরে। টর্চ নিভিয়ে অন্ধকারের মধ্যে উঠতে থাকি। একটি অপরাজিতা লতা মাটি থেকে খাড়া ছাতের ওপরে উঠে ছাতের একটি অংশের ওপরে ঘন ঝোপ সৃষ্টি করেছে, ছাতে উঠেই সেখানে চটপট ঢুকে পড়ি।

লতাঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে ছাতের টালি একটা একটা করে সারিয়ে ফেলতে থাকি। তিন চারটে টালি সরিয়ে ফেলতেই একটি চৌকো গহ্বর সৃষ্টি হল। আমাদের শরীরের অনুপাতে গহ্বরটিকে বড়ো বলেই মনে হচ্ছে। গলে যেতে অসুবিধে হবে না।

পড়ে কী বুঝলে?

১. প্রবীরদের ল্যাবোরেটরি কোথায় ছিল?
২. ল্যাবোরেটরির টালির ছাদ কোথায় ছিল?
৩. উঁচু টেবিলটি কোথায় রাখা ছিল?

গলে যাবার আগে ভেতরটা দেখে নেওয়া দরকার। এই গহ্বরের মধ্যে দিয়ে নিচের দিকে টর্চের আলো ফেলি।

টর্চের আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে ল্যাবোরোটরির ঘরের একটি অংশ। এখানে একটি উঁচু টেবিল বসানো আছে। এই টেবিলের ওপর থেকে ছাতের উচ্চতা ছ-সাত ফুটের বেশি নয়। কাজেই ছাত থেকে ওখানে লাফিয়ে পড়তে কোন অসুবিধে নেই।

লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় আমার কানে এল একট তীক্ষ্ণ চিৎকার। নিচের ঘাসের জঙ্গলজোড়া অন্ধকারকে কাঁপিয়ে তুলে কে যেন আমার উদ্দেশে চিৎকার ক'রে বলছে ঃ

'কে ঐ ছাদের ওপরে? শিগ্‌গির নেমে এস...'

নেমে এলাম ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গেই নামলাম লাফিয়ে। কিন্তু ঘাসের জঙ্গলে নয়, ল্যাবোরেটারি ঘরের টেবিলের ওপরে। টেবিল থেকে নেমে হাঁপাতে থাকি। হাঁপাতে হাঁপাতে কার কণ্ঠস্বর বোঝার চেষ্টা করি। হয় রণবীর বাবু নয়তো তাঁর ছেলে প্রবীর চিৎকার করছিল। দুজনের গলার স্বর প্রায় এক রকম, কাজেই কার গলার স্বর বুঝতে পারি না।

অন্ধকার ল্যাবোরেটারি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি রুদ্ধশ্বাসে। আমার উদ্দেশে ঘাসবনের মধ্যে যে চিৎকার করছিল আমাকে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে দেখে সে হয় তো ল্যাবোরেটারির সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়বে।

যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।

অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝলাম যে কেউ আসছে না, তখন সুইচ্ টিপে ল্যাবোরেটারি

ঘরের আলো দিলাম জ্বালিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক পরীক্ষার সরঞ্জাম এবং ঘরের দেয়াল ঘেঁষে ডেস্কের ওপরে কয়েকটি পোর্সেলিনের পাত্রে রাখা পাথরের নমুনা চোখে পড়ল। কয়েকটি বালির নমুনাও দেখতে পাই।

তাদের পরীক্ষা করি। কোয়ার্টজ ফেলস্পার এবং কোয়ার্টজ ও ফেলস্পার-এর সঙ্গে সহ-অবস্থিত আর একটি সাদা রঙের খনিজ চোখে পড়ে। বালির মধ্যেও তা সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করছে। কোয়ার্টজ (Quartz) ও ফেলস্পারকে (feldspar) দেখামাত্র চেনা যায়, কিন্তু এই তৃতীয় খনিজটিকে সনাক্ত করতে পারি না।

চিনতে পারিনা না বলে প্রাণপণ চিন্তা করি, জিনিসটা কি। চিন্তা করে কুলকিনারা না পেয়ে তার একটা নমুনা কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সেখানে ল্যাবোরেটারি পরীক্ষা করার কথা ভাবতে থাকি। ডেস্কের ওপরে ঝুঁকে পড়ে একটা নমুনা তুলে নিতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় কে একজন আমার পেছনে এসে দাঁড়ায়।

যে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে এক পা একপা করে একেবারে আমার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়ায়। আমার পিঠে ঠান্ডা, অথচ তীক্ষ্ণ ধাতুর স্পর্শ পাই।

চমকে উঠে আমার পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি যে একটি পিস্তল উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছেন রণবীর বাবু।

'ওঃ তুমি!' রণবীর বাবু পিস্তল নামালেন ঃ ভেবেছিলাম কোন চোর ঢুকেছে ল্যাবোরেটারির মধ্যে, পেছন থেকে চিনতে পারিনি তোমাকে...'

'চোরই বটে।' মৃদু হেসে বললাম আমি, 'চুরি করে দেখতে এসেছিলাম ল্যাবোরেটারির কার্যকলাপ। আশা করি বুঝতে পারছেন যে এ কাজ আপনার জন্যই করছি আমি...'

'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। মাপ কর আমাকে...'

এমন সময় হঠাৎ নিভে যায় ল্যাবোরেটারির আলো আলো নিভে গেলেও ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হয় না, একটা অস্ফুট বেগনী রঙের আলো ঘরের অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে রাখে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ময়কর অথচ ভয়ঙ্কর দৃশ্য সমস্ত ঘর জুড়ে অট্টহাসির মত জেগে ওঠে। জ্বলন্ত চোখ। একটা নয়, অনেকগুলো। ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। আমি ও রণবীর বাবু ছাড়া ঘরের মধ্যে কোন জীবিত প্রাণী নেই, পোকামাকড়, টিকটিকি কিছুই নেই, অথচ রাশি রাশি জ্বলন্ত চোখ ঘর জুড়ে যত্রতত্র বিরাজ করছে।

আগুনের গোলার মত জ্বলন্ত চোখ, কেউ নেই, কিন্তু চোখ আছে! যেন কায়াহীনের চোখ।

ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন রণবীর বাবু। আর্তস্বরে বলেন, 'ভুত, ভুত, শিগগির পালাও...'

পরমুহূর্তে ভারী কিছু মেঝেতে পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাই। বুঝতে পারি যে রণবীর বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছেন।

একটু বাদে আলো জ্বলে ওঠে। আলো জ্বলে উঠতেই প্রবীরকে দেখতে পাই । আমার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদুমন্দ হাসতে থাকে সে। হাসতে হাসতে বললে, 'জ্বলন্ত চোখ দেখে বাবার মত তুই ভয় পাসনি দেখছি।'

'ভয় পাব কেন?' আমি বললাম, 'পাথর দেখে কি কেউ ভয় পায়?'

'জ্বলন্ত চোখকে তুই পাথর বলছিস!'

'পাথরকে পাথর ছাড়া আর কি বলব। বেগনী-পেরোনো আলোর মধ্যে জ্বল জ্বল করছিল স্বয়ংপ্রভ পাথর। কোয়ার্টজ, ফেলস্পার ও অভ্রের সঙ্গে এই পাথর সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ঘরময় রাখা হয়েছে। বেগনী-পেরোনো আলোর ল্যাম্প, মানে আলট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্পটা তুইই জ্বালিয়ে দিয়েছিলি, সঙ্গে সঙ্গে পাথরগুলো জ্বলন্ত হয়ে গেল, তাই না?'

'ঠিক বলেছিস। এখন বল্ স্বয়ংপ্রভ পাথরটাকে চিনেছিস কিনা?'

'চিনেছি বলেই মনে হচ্ছে।' আমি জবাব দিলাম, 'টাংস্টেন নামক ধাতুযুক্ত খনিজ শিলাইট (scheelite)... স্বয়ংপ্রভ... বেগনী-পেরোনো আলোয় তা জ্বল জ্বল করে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে তোদের অভ্রের খনির মধ্যে শিলাইট পেয়েছিস...'

'হ্যাঁ পেয়েছি।' প্রবীর বললে, 'ডক্টর অধীর দে'র সাহায্যে আমাদের অভ্রের খনির মধ্যে শিলাইট আবিষ্কার করেছি। বাবার জ্ঞান ফিরলে বাবাকে বুঝিয়ে দিস যে তাঁর খনির মধ্যে খুব মূল্যবান জিনিস খুঁজে বের করেছেন অধীর দে...'

পড়ে কী বুঝলে?

১. ল্যাবোরেটরিতে অন্ধকার ঘরেও কী রঙের আলো দেখা যাচ্ছিল?

২. টাংস্টেন কী জিনিস?

৩. ডঃ দে কাজ সারা হতেই কোথায় ফিরে গিয়েছিলেন?

'ডক্টর অধীর দে'র সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দে না ভাই।' মিনতিপূর্ণ স্বরে বললাম আমি।

'উঁহু! গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল প্রবীর, ডক্টর দে তাঁর কাজ সারা হতেই আমেরিকা ফিরে গিয়েছেন। ভবিষ্যতে কখনো যদি আসেন, তখন আলাপ কোরো...'

□□□

জেনে রাখো

বর্ণালি — তিন কোনা কাচের ভিতর দিয়ে আলো ঠিকরোনোর কারণে রামধনুর রঙের মতো যে রঙ বের হয়, তাঁকে বলে বর্ণালি।

ভূ-বিজ্ঞানী — 'ভূ' অর্থাৎ পৃথিবীর নানা বিষয় নিয়ে যিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তিনি ভূ বিজ্ঞানী।

সাহচর্যে — কাছাকাছি আসা।

হতবুদ্ধি — যেখানে বুদ্ধি কাজ করেনা।

হিতাকাঙ্খী — যিনি হিত অর্থাৎ ভালো (মঙ্গল) কামনা করেন।

ভাঁওতা — মিথ্যা বলে ঠকানো।

গহ্বর — গর্ত, গুহা, সংকীর্ণ গভীর জায়গা।

সুবর্ণ সুযোগ — খুব ভালো সুযোগ।

উদ্ভাসিত — আলোকিত।

খনিজ — যা খনিতে জন্মায়।

সনাক্ত — পরিচয় দিয়ে নির্দেশ করা।

স্বয়ংপ্রভ — যে নিজেই আলো দেয়।

রাহুগ্রস্ত — গ্রহণের সময় চাঁদের উপর পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে।
ভারতীয় জ্যোতিষে রাহু গ্রহ বলে পরিচিত। আবার পুরাণের কাহিনি অনুসারে বিষ্ণু এক দানবকে দুটি খন্ড করে ফেলেছিলেন। তার মুন্ড বা মাথা হলো রাহু আর দেহটি হলো কেতু।

পাঠবোধ

1. নিজের বাক্যগুলির মধ্যে ঠিকগুলিতে (✓) এবং ভুল গুলিতে (✗) চিহ্ন দাও—
   (ক) গিরিডির কাছে রণবীরবাবুর অভ্রের খনি আছে।
   (খ) ডঃ অধীর দে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক।
   (গ) ল্যাবোরেটারিটা ছিল রণবীর বাবুর বাড়ির পিছনে।
   (ঘ) সাত-আটটি টালি সরিয়ে ফেলতেই একটা চৌকো গহ্বর সৃষ্টি হলো।
   (ঙ) প্রবীরদের অভ্রের খনির মধ্যে গ্রানাইট আবিষ্কৃত হয়েছিল।

অতি সংক্ষেপে উত্তর লেখো :

2. লেখকের ('জ্বলন্ত চোখ' গল্পে) বন্ধু প্রবীর কোথায় থাকতো?
3. রণবীর বাবুর অভ্রের খনি কোথায় ছিল?
4. গিরিডিতে কোন জায়গায় রণবীর বাবুর বাড়ি ছিল?
5. প্রবীরের বাবা 'বাজে লোক' কাকে বলেছিলেন?

সংক্ষেপে লেখো :

6. 'যদি সত্যিই ওর হিতাকাঙ্খী হও, ওকে অধীর দের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করো।' — কে কাকে এই কথা বলেছিলেন? এবং কেন?
7. 'জ্বলন্ত চোখ' গল্পে লেখক রণবীর বাবুর ল্যাবোরেটরিতে বাইরে থেকে কী দেখতে পেলেন?

8. ল্যাবোরেটারির দেয়ালটি লেখক কি ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন? দেয়ালটি কেমন অবস্থায় ছিল?
9. রণবীর বাবু কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন?
10. প্রবীর দের অভ্রের খনিতে কী পাওয়া গিয়েছিল?

বিস্তারিতভাবে লেখো :

11. অধীর দে কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় দাও। তিনি কিভাবে প্রবীরকে সাহায্য করেছিলেন, বিস্তারিতভাবে লেখো।
'জ্বলন্ত চোখ' কাকে বলা হয়েছে? এ বিষয়ে যা জান, বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি :

1. নিজের শব্দগুলির ব্যাসবাক্য এবং সমাস লেখো

হিতাকাঙ্খী	রাহুগ্রাস
কার্যকলাপ	সুবর্ণ সুযোগ
কূল কিনারা	ভূবিজ্ঞানী

2. এক কথায় লেখো —

যার কোন উপায় নেই।
যার দু-হাত সমানভাবে চলে
যা অবশ্যই হবে
আগে জন্ম হয়েছে যার
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে
যে গাছ কোন কাজে লাগে না

3. পদ পরিবর্তন করো —

পরীক্ষা	উপকৃত
গোপন	রাসায়নিক
শরীর	চিন্তা

4. নিচের সাধুভাষায় লেখা অংশটিকে চলিত ভাষায় লেখো —

এমন সময় হঠাৎ নিভিয়া যায় ল্যাবোরেটরির আলো। আলোক নিভিয়া গেলেও ঘর সম্পূর্ণভাবে অন্ধকার হয় না। একটি অস্ফুট বেগনী রঙের আলো ঘরের অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখে।

5. 'জ্বলন্ত চোখ' কাহিনীটিতে যে আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখো।
করতে পারো—

বিজ্ঞানের নানারকম আবিষ্কারের বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। সেগুলি সম্বন্ধে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারো।

□□□

নন্দলাল বসু

ডাঃ (ক্যাপ্টেন) দিলীপ কুমার সিন্‌হা

নন্দলাল বসু (লেখক)

ভারতশিল্পী নন্দলাল বসুর জন্ম হয়েছিল বিহারের মুঙ্গের শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে হাবেলি খড়গপুরে। তারিখটা ছিল ৩ ডিসেম্বর ১৮৮২। বাবা পূর্ণচন্দ্র বসু ছিলেন ওভারসিয়ার। ওখানেই বাঁধের কাজের দেখা শোনা করতেন। নন্দলালের মা ক্ষেত্রমোহিনী দেবী শিশু নন্দলালকে মাটির পুতুল গড়ে দিতেন। নন্দলাল অবাক হয়ে দেখতেন। কুমোরটুলিতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখতেন কিভাবে হাতের আঙুলের টানে মাটির ঘড়া, প্রদীপ তৈরি হয়ে ওঠে। গ্রামের মেলায় দুর্গাপ্রতিমার চালে গণেশ, মাটির পুতুলের দোকানে হাতি, বলদের মূর্তি তার কাছে জীবন্ত মনে হত। বাড়িতে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনতেন আর মনে হত চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছেন। লোভ হোত শিল-কুটুলিদের আনা ছেনি-হাতুড়ি দেখে। ভোঁতা পেরেক পিটিয়ে ছেনি তৈরি করতেন। আঁকিবুকিতে ভরে দিতেন ঘরের দেয়াল, স্নানঘরের চৌবাচ্চা, বাঁধের পাথর।

পড়ে কী বুঝলে ?

১. ভারতশিল্পী নন্দলাল বসুর জন্ম হয়েছিল বিহারের-..... শহর থেকে ৩০ কি.মি. দূরে হাবেলি খড়গপুরে।
কোনটি ঠিক ? (ভাগলপুর/মুঙ্গের)

২. গ্রামের মেলায় নন্দলাল কী কী দেখেছিলেন ?

৩. নন্দলাল বসু কিভাবে ছেনি তৈরি করতেন ?

৪. নন্দলাল কবে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেছিলেন ?

স্কুলের পড়া শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় এলেন। পড়াশোনা চলতে লাগল। ১৯০২ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করলেন। সে বছরই বিয়ে হল তাঁর সুধীরা দেবীর সাথে। কিন্তু শুধুই পড়াশোনা ভালো লাগছিল না তাঁর। ছবির জগৎ তাঁকে ক্রমাগত হাতছানি দিচ্ছিল। বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি।

কলকাতায় যে পাড়ায় তিনি থাকতেন সে পাড়ায় একটি ছেলে থাকত, যে শান্তিনিকেতনের আর্টস্কুলে ছবি আঁকা শিখত। তাকে বারবার অনুরোধ করাতে একদিন সে ছেলেটি তাঁকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছিলেন। তিনি তাঁর চশমার ওপর দিয়ে নন্দলালকে ভালোভাবে দেখলেন। তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার ? স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছ ? লেখাপড়া আর ভালো লাগছেনা ? কোন ক্লাস হল ?'

নন্দলালের তখন এত বড় মানুষটার সামনে ভয়ে হাত পা কাঁপছে। কোনোক্রমে উত্তর দিলেন, 'স্কুল নয়, কলেজে পড়ি। ছবি আঁকতে ভালোবাসি।'

অবনীন্দ্রনাথ আশ্চর্যভাব দেখিয়ে বললেন, 'সত্যি ? ঠিক আছে, তোমার কলেজে পড়ার কাগজ দেখিও। এখন যাও।

পড়ে কী বুঝলে ?

১. কার সামনে ভয়ে নন্দলালের হাত-পা কাঁপছিল ?

২. অবনীন্দ্রনাথের অনুরোধে কে নন্দলালের ছবিগুলি দেখেছিলেন ?

৩. লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে নন্দলাল কার ছবি এঁকে দেখিয়েছিলেন ?

৪. দেশ-বিদেশের প্রদর্শনীতে কার ছবি পুরস্কৃত হয়েছিল ? (নন্দলাল/অবনীন্দ্রনাথ)

কয়েকদিন পরেই নন্দলাল ফিরে এলেন। কলেজে পড়ার প্রমাণপত্র আর নিজের আঁকা কিছু ছবি অবনীন্দ্রনাথের সামনে তুলে ধরলেন। অবনীন্দ্রনাথের অনুরোধে আর্টস্কুলের প্রধান অধ্যাপক হেডেল ছবিগুলো দেখলেন। তিনি নন্দলালকে লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন পরীক্ষা করে দেখতে। লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ নন্দলালকে ছবি আঁকতে বললেন। নন্দলাল গণেশের ছবি এঁকে দেখালেন। ঈশ্বরীপ্রসাদের পছন্দ হল। বললেন, ছবি আঁকা শিখতে পারবে। তুলির টানের মধ্যে মাপজোক

আছে। নন্দলালের স্বপ্ন সত্যি হল।

আর্টস্কুলে নন্দলাল তাঁর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অনেক কাছে আসতে পারলেন। ধীরে ধীরে তাঁর ছবির সুনাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দেশবিদেশের প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হল তাঁর ছবি। অবনীন্দ্রের দীক্ষায় এবার শুরু হল তাঁর ভারতশিল্পের সন্ধান। ভারতবর্ষের নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকা নানান শিল্প ও চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হতে নন্দলাল ভারতদর্শনে বেরলেন।

প্রথমে এলেন পাটনায়। জালান পরিবার কর্তৃক রক্ষিত রাজপুতানা শৈলীর চিত্রাঙ্কণ ও জৈন চিত্রাঙ্কণ দেখলেন। তারপর বারাণসী। বারাণসীর গঙ্গায় ঘাটের মন্দির, বাঁশের ছাতা, স্নানরত পুণ্যার্থী তাঁর মনে আঁকা হয়ে গেল। তারপর পৌঁছোলেন সারনাথ। হাজার বছরের পুরোনো ধর্মচক্র, স্তূপ ইত্যাদি দেখলেন। নিজের স্কেচবুকে সবকিছুর ছবি এঁকে রাখলেন। তারপর গিয়ে দেখলেন লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, তাজমহল।

পড়ে কী বুঝলে?

১. হাজার বছরের পুরোনো ধর্মচক্র, স্তূপ ইত্যাদি নন্দলাল কোথায় দেখেছিলেন?

২. নন্দলাল বসু কার অনুরোধে অজন্তায় তিন মাস কাটিয়েছিলেন?

৩. ওরিয়েন্টাল আর্ট কলেজে কাজ করার পর নন্দলাল কোথায় যোগদান করেছিলেন?

৪. কোন দেশগুলির সাথে ভারতের নাড়ির টান রয়েছে?

ফিরে এলেন গয়া, সাসারাম হয়ে তাঁর জন্মস্থল - হাবেলী খড়গপুরে। সেখানে সুধীরা দেবী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আর অপেক্ষা করছিল তাঁদের শিশু সন্তানটি।

এবার শুরু হল দক্ষিণ ভারতের যাত্রা। পুরী, ভুবনেশ্বর হয়ে তামিলনাড়ু। শিবের তান্ডবনৃত্য, কাঞ্চিপুরম, তাঞ্জোর আর মাদুরাইয়ের মন্দির পরবর্ত্তীকালে বার বার তাঁর ছবিতে ফিরে এসেছে। সিস্টার নিবেদিতা এবং লেডি হেরিংহ্যামের অনুরোধে নন্দলাল অজন্তায় কাটালেন তিন মাস।

একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'আমি তোমার ছবি দেখেছি। তুমি আমার কবিতার বই চয়নিকাতে ছবি আঁকবে।'...কিছুদিন জোড়াসাঁকো, কিছুদিন ওরিয়েন্টাল আর্টকলেজে কাজ করার পর নন্দলাল শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগদান করলেন। তাঁর নিজের করা ম্যুরাল ও নানা রকম শিল্পকাজে সেজে উঠল শান্তিনিকেতনের সংগ্রহালয়।

এরই মাঝে একদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাথে সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলো ঘুরে আসার সুযোগ হল। ভারতের নাড়ির টান যে ওই দেশগুলোর সাথে। এশিয়ার শিল্পসম্ভার সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন নন্দলাল।

তারপর আর থামা নেই। একদিন বরোদার মহারাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বরোদার কীর্ত্তিমন্দির সেজে উঠল তাঁর ম্যুরালের অলঙ্করণে।

পড়ে কী বুঝলে?

১. বরোদার মহারাজা নন্দলালকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন?

২. শিল্পী বলতে.....নন্দলাল ছাড়া আর কারোর কথা ভাবতেই পারতেন না। কে? (গান্ধীজী/রবীন্দ্রনাথ)

৩. নন্দলাল ডান্ডিমার্চে কার লিনোকাট (পাথরছাপা) এঁকেছিলেন?

গান্ধীজীর ডান্ডি মার্চে সারা দেশে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জেগে উঠল। নন্দলাল আঁকলেন ডান্ডিমার্চে গান্ধীজীর এক অনন্য লিনোকাট (পাথরছাপা)। মহাত্মা গান্ধী ডেকে পাঠালেন নন্দলাল বসুকে। বললেন আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের সাজ ও অলঙ্করণের দায়িত্ব নিতে। প্রথমে ফৈজপুর। তারপর হরিপুরা। হরিপুরা কংগ্রেসের অনবদ্য পোস্টারগুলো ভারতের জনজীবনের ভিত্তিচিত্র হয়ে উঠল।

শিল্পী বলতে গান্ধীজী নন্দলাল ছাড়া আর কারোর কথা ভাবতেই পারতেন না। হরিপুরা কংগ্রেসের কাজের সময় নন্দলালকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখে গান্ধীজী তাঁকে নিজের সাথে নিয়ে গেলেন তিথল, হাওয়া বদলের জন্য। নন্দলালও আবার

খুব ভালোবাসতেন কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য কাজ করতে। কেননা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির মাঝে নতুন শিল্পসামগ্রী ও নতুন শিল্পরূপ নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা হোত। জনসমুদায়ের শিল্প কেমন হতে পারে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার অবসর পেতেন।

স্বাধীন ভারতে দেশের সংবিধানের মূল প্রতিটিকে সাজিয়ে তোলার জন্য ডাক পড়ল নন্দলাল বসুর। আরো কয়েকজন শিল্পীর সাথে মিলে তিনি সাজিয়ে তুললেন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধান।

শেষজীবনে দেশ অনেক সম্মানে বিভূষিত করল তাঁকে - দেশিকোত্তম, পদ্মবিভূষণ, সাম্মানিক ডি-লিট ইত্যাদি।

১৬ই এপ্রিল ১৯৬৬ তারিখে বিহারের মাটির এই কৃতি সন্তান মহান ভারতশিল্পীর জীবনাসান হয়। দেশের মানুষের কাছে শিল্প শেখার এবং নিজের যাবতীয় সৃজনকর্ম তাদেরই হাতে পৌঁছে দেওয়ার তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

জেনে রাখো

ছেনি — ধাতু কাটার যন্ত্র

হাতুড়ি — পেরেক ঠুকবার যন্ত্র

শিলকুটুনি — লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়েরা পাথর কাটার যন্ত্র দিয়ে শিল-নোড়ার উপর খোদাই করতো। এই কাজই এদের পেশা ছিল। এদের বলা হতো শিলকুটুনি। এখনও এদের দেখা যায় মাঝে মাঝে।

দীক্ষা — মন্ত্রোপদেশ।

তান্ডব নৃত্য — ভারতীয় পুরাণের কাহিনি অনুসারে, দক্ষের গৃহে যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁর কন্যা সতী পিতার মুখে নিজের পতি শিবের নিন্দা সহ্য করতে না পেরে প্রাণ ত্যাগ করেন। পত্নী বিয়োগে ক্রুদ্ধশিব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে প্রচন্ড নৃত্য করতে থাকেন। বিষ্ণু তখন সতী দেহ নিজের চক্র দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে দেন। সতীর দেহের অংশগুলি যে যে জায়গায় পড়েছিল, সেগুলি পীঠস্থান বা তীর্থস্থান রূপে খ্যাত হয়েছে। পাকিস্তান, নেপাল সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই রকম ৫১টি পীঠস্থান আছে। — শিবের এই দুর্দান্ত নৃত্যকে বলা হয় তান্ডবনৃত্য।

ম্যুরাল — আর্ট বা শিল্পকলার একটি বিশেষ প্রকার।

অভূতপূর্ব — যা আগে কখনও ঘটেনি।

লেখক পরিচয় —

ডাঃ (ক্যাপ্টেন) দিলীপ কুমার সিংহ। জন্ম ১৯৪৭ সালে পাটনায়। শিক্ষা রাঁচিতে এবং পাটনায় । পেশায় চিকিৎসক। কর্মজীবন— প্রথম জীবনে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। পরে পাটনা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেন এবং সুচিকিৎসক রূপে খ্যাত হন। তিনি বিশিষ্ট সমাজসেবী । বিহারে বাঙালিদের প্রতিষ্ঠা ও অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁর নিঃস্বার্থ সহযোগ ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বাংলা ভাষার প্রচার প্রসার এবং উন্নতিকল্পে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তথাকথিত নিয়মিত লেখক না হলেও, তাঁর নিজস্ব ভাষা ভঙ্গিমা ও সাবলীল লিখনশৈলী পাঠককে আকৃষ্ট করে।

পাঠবোধ

খালি জায়গায় ঠিক উত্তরটি লেখো

1. ভারত শিল্পী ..... জন্ম হয়েছিল ১৮৮২ সালের ৩রা ডিসেম্বর। (পূর্ণচন্দ্র বসুর / নন্দলাল বসুর)
2. নন্দলাল বসুর বাবা ছিলেন.....। (ওভারসিয়ার / ইঞ্জিনিয়ার)
3. .....জগৎ নন্দলালকে ক্রমাগত হাতছানি দিচ্ছিল । (গানের / ছবির)

4. ..... দীক্ষায় এবার শুরু হলো তাঁর ভারত শিল্পের সন্ধান । (রবীন্দ্রনাথের/অবনীন্দ্রনাথের)

5. ..... সাথে নন্দলালের সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলো ঘুরে আসার সুযোগ হলো।
(মহাত্মা গান্ধীর / রবীন্দ্রনাথের)

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. কে শিশু নন্দলালকে মাটির পুতুল গড়ে দিতেন?
7. বাড়িতে কোন গল্প শুনে নন্দলালের মনে হতো চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছেন?
8. উচ্চ শিক্ষার জন্য নন্দলাল কোথায় এসেছিলেন?
9. "স্কুল নয়, কলেজে পড়ি। ছবি আঁকতে ভালোবাসি।" — কে কাকে একথা বলেছিলেন?
10. নন্দলাল ভারতদর্শনে গিয়েছিলেন কেন?

সংক্ষেপে লেখো

11. কুমারটুলিতে গিয়ে নন্দলাল কী দেখতেন?
12. কে নন্দলালকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গিয়েছিল?
13. প্রথম আলাপের সময় অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে কী বলেছিলেন?
14. গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধান সাজিয়ে তোলার জন্য কার ডাক পড়েছিল?
15. শেষ জীবনে দেশ নন্দলাল বসুকে কী কী সম্মানে বিভূষিত করে?

বিস্তারিতভাবে লেখো

16. কিভাবে নন্দলালের স্বপ্ন সত্যি হলো?
17. নন্দলাল ভারতদর্শনে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন? বিস্তারিতভাবে লেখো।
18. মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নন্দলালের কিভাবে যোগাযোগ হলো? এই সময়ে নন্দলাল কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং কার নির্দেশে? বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. ব্যাসবাক্য সহ সমাস লেখো
   ক) ভারত শিল্পী
   খ) পড়াশোনা
   গ) দেশ বিদেশ
   ঘ) শিল্প সম্ভার
   ঙ) জন্মস্থান
   চ) শান্তিনিকেতন
   ছ) লোক সংস্কৃতি
2. সন্ধি ভেঙে লেখো
   ক) ক্রমাগত
   খ) দেশিকোত্তম
   গ) আশ্চর্য
   ঘ) প্রধানাধ্যাপক
   ঙ) চিত্রাঙ্কন
   চ) সংগ্রহালয়
   ছ) ভুবনেশ্বর

3. বামদিকের শব্দগুলির সঙ্গে ডানদিকের বিপরীত শব্দগুলি মেলাও

বাম দিক	ডান দিক
জন্ম	অপরিচিত
জীবন্ত	অখ্যাতি
সত্যি	মৃত্যু
খ্যাতি	মিথ্যা
পরিচিত	মৃত

4. নিচের সাধুভাষায় লেখা অংশটি চলিত ভাষায় লেখো

কলিকাতায় যে পড়ায় তিনি থাকিতেন সেই পাড়ায় একটি ছেলে থাকিত যে শান্তিনিকেতন আর্টস্কুলে ছবি আঁকা শিখিত। তাহাকে বারংবার অনুরোধ করাতে একদিন সেই ছেলেটি তাঁহাকে অবনীন্দ্রনাথের নিকট লইয়া গেল।

5. শিল্পী নন্দলাল বসু সম্পর্কে তোমার পাঠটিতে যা জেনেছ, সে বিষয়ে বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখো।

আলোচনা করো।

নিজের মতো করে জানা বিষয় নিয়ে ছবি আঁকো। মাটির পুতুল, পশু-পাখি তৈরি করে রঙ দাও।

তোমাদের আলোচ্য পাঠটির নানা তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর (ক্যুইজ) ও বিতর্কের (ডিবেট) আয়োজন করতে পারো।

বাঘ - বন

সুকুমার দে সরকার

খরস্রোতা নদী বেয়ে নৌকো চলেছে। নদীর একপাড়ে কেওড়া গাছের দল নদীর জলে ঝুঁকে পড়েছে। চুল এলিয়ে ছায়া দেখছে যেন। নদীর ওপারে ধোঁয়াটে সবুজ ধু-ধু বনরেখা। তারপরে সীমারেখা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সীমাহীনে। নৌকোর ওপর তিনজন লোক । গহর মাঝি, রহিম বাওয়ালী আর শিকারী প্রদীপ সেন। প্রদীপ সেন নানা বনে শিকার করে বেড়িয়েছে। সুন্দরবনে এই তার প্রথম।

নদীর এপারে বিস্তৃত পলিমাটির চর। তার ওপর পড়ন্ত রোদ পড়ে রূপোলি আভা। কাদার ওপর পড়ে আছে একটা কুমির। মুখটা হাঁ-করা। ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলোর ফাঁকে একটা পাখি কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আদিম সরীসৃপটার অনড় কাঁচের মতো চোখগুলো দিগন্তে স্থির।

এ যেন পৃথিবীর এক অন্য রূপ। নৌকোর ওপর থেকে প্রদীপের চোখে কৌতূহলমাখা বিস্ময়। এখানের এই পৃথিবীর যেন পরিবর্তন নেই। সৃষ্টির আদি থেকে জলস্রোত আনন্দে নাচতে নাচতে বিশাল বনভূমির ভেতর দিয়ে সহস্রধারায় সাগরের দিকে ছুটে চলেছে।

অকারণ জানোয়ার মারাই প্রদীপের উদ্দেশ্য নয়। বন্য পৃথিবী তার মনকে টানে। শিকারীর জগৎ কখনও হিংস্র ভয়ানক, কখনও আবার মায়াকাজলমাখা মধুর।

নদীর পাড়ে পলি-কাদার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে লম্বা পা ফেলে হাঁটছে দুটো মানিকজোড় পাখি। লাল সরু বেতের মতো লম্বা পা । উরুর কাছটায় অল্প সাদা লোম। বুকটা সাদা আর পিঠের ওপর সাদা কালো পালকে ভরা। যেন হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে দুই ছুঁচিবাই বুড়ি যত রাজ্যির অমঙ্গল এড়িয়ে এড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরে চলেছে। নদীর পাড়ে কেওড়া গাছের দলের মাঝখানে হঠাৎ একটা মাদার গাছ ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে। দূরে কালচে সবুজ ঘন রেখায় কাঁপছে সুন্দরবন।

আকাশের রঙ পালটাচ্ছে। হালকা মেঘে নিঃশব্দ আজান। রহিম বাওয়ালী নমাজ পড়ছিল। একটি দমকা হাওয়া নদীর ওপর ঘুরপাক খেয়ে নেচে গেল। হাল চেপে ধরে গহর মাঝি বলে উঠল, 'বদর বদর। একটু সামলে কর্তা।' জোর হাতে হাল আঁকিয়ে বাঁকিয়ে ঘূর্ণি দ কাটিয়ে নিল মাঝি। নৌকো তীরের মতো ছুটে চলল দক্ষিণে । দু-পাশে বন। আকাশের দিকে চেয়ে প্রদীপ বলল, 'সন্ধে নামবার খুব দেরি নেই মাঝি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা' মাঝি জবাব দিল, 'সুমুখেই গরানখালির খাঁড়িতে নৌকো ভিড়োব। সাঁঝের আগেই পৌঁছে যাব।' একটু থেমে মাঝি প্রশ্ন করল, 'আপনি কি সোঁদরবনে এই পরথম আলেন কর্তা?'

'হ্যাঁ। কী করে বুঝলে?'

'সোঁদরবনে একা তো কেউ আসে না বাবু। অনেক যোগড়যন্ত্র করে সাহেবরা আসেন। সোঁদরবনের ওনারা বড় চালাক নোগ। চিনতে বুঝতে সময় লাগে।'

'তবে তোমরা কী ভরসায় আমার সঙ্গে এলে।?'

মাঝি বলল, 'আমরা বনের মানুষ কর্তা। খোদাতালার মর্জি হয় — বনেই জানটা দিতে হবে। বনই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তাছাড়া ওই বাওয়ালীকে সঙ্গে এনেছি।' মাল্লা রহিমের দিকে দেখিয়ে দিল মাঝি।

বাওয়ালী হল এই দখিন বনাঞ্চলের বাঘের ওঝা। ওরা অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে মন্ত্রর করে বাঘ তাড়ায়। বাঘের ওঝা

রহিম বাওয়ালীকে দেখে প্রদীপের হাসিই পেল। খালি গা, পরনে একটা লুঙ্গি। শরীরের পেশীগুলো পাকানো কঠিন। থুতনিতে কাঁচা-পাকা একটু দাড়ি। নমাজ সেরে, কাঁধে গামছাটা ফেলে রহিম তখন হাত মুখ ধুচ্ছিল। হঠাৎ বলে উঠল 'দেখেন, দেখেন কর্তা।'

দূরে স্রোত কেটে কালো কুটোর মতো কী যেন একটা ভেসে আসছে।

'কী ওটা' বলতে বলতে প্রদীপ বাইনোকুলাটা চোখে তুলে ধরল। জবাল দিল রহিম ঃ 'ওনার তাড়া খেয়ে জলে

ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখান থেকে চোট করতে পারবেন কর্তা?'

'ওটা তো জল কেটে নৌকোর দিকেই এগাচ্ছে মনে হচ্ছে।,'

'আজ্ঞে কর্তা, হরিণ ওনাদের তাড়া খেয়ে অনেক সময় মানুষের দিকে ছুটে আসে, জান ভিক্ষে চায়।'

'যে জানোয়ার জান ভিক্ষে চাইছে তাকে মারতে বলছ রহিম?'

'আজ্ঞে না কর্তা, ওকে মারতে বলিনি। তাছাড়া ওটা মায়াহরিণ।'

প্রদীপ একবার মুখ তুলে চাইল, তারপর বুঝে নিল। মায়াহরিণ মানে মাদী হরিণ। মায়াহরিণকে শিকারী শিকার করে না। 'কাকে তবে চোট করতে বলছিলে?' সে প্রশ্ন করল।

'হরিণটার পেছনে একটা কুমির আসছে।'

'কই?' প্রদীপ রাইফেলটা তুলে নিল। চোখে তার বাইনোকুলার লাগানো আছে।

'ওই যে একটা জলের দাগ সোজা এগিয়ে আসছে জোয়ারের ঢেউয়ের মতো।' রহিম জবাব দিল।

জলময় বন কাঁপিয়ে প্রদীপের রাইফেলটা গর্জে উঠল। জলের একটা আছাড়ি-পিছাড়ি। প্রাণভয়ে পাশ কাটিয়ে হরিণটা ওপারে বনের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল।

গহর মাঝি চেঁচিয়ে উঠল, 'ভুল করেছ বাওয়ালী। কুমির নয়—অজগর।'

পড়ে কী বুঝলে?

১. প্রদীপ সেন কোন বনে শিকার করতে বেরিয়েছিল?

২. লাল সরু বেতের মতো লম্বা পায়ের পাখি দুটির নাম কি?

৩. গহর মাঝি নৌকো কোথায় ভিড়াবে?

৪. জলে হরিণটার পেছনে কী আসছিল?

এক ঘন্টার মধ্যেই ওদের নৌকো গরানখালির খাঁড়িতে এসে ঢুকল। সুন্দরবনের ভেতর এই খাঁড়িগুলো নদীর দুটো বড় শাখার ভেতরের যোগাযোগ। এবারে খাঁড়ির দু-পাশেই ঘন বন। খালি গরান আর সুঁদুরী গাছ। ঘন হয়ে সূর্যের আলোর লোভে, বেশ খানিকটা ডিঙি মেরে লম্বা হয়েই যেন তারপরে ডালপালা পাতা মেলেছে। সারা বনটার মাথায় তাই যেন মনে হয় কেউ সবুজ ছাতা মেলে ধরে আছে। মাটিতে শূলের মতো অজস্র শক্ত শেকড় উঁচু হয়ে আছে। এদেশী লোকেরা ওগুলোকে শুলো বলে।

রহিম বাওয়ালী দুপাশের বন তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল। 'মাঝি, দেখতে পাচ্ছ?' রহিম বলল আকাশে গাছের মাথায় তাকিয়ে। মাঝি জবাব দিল, 'হ্যাঁ দেখেছি।'

'কী? কী দেখছ?' রাইফেলটা বাগিয়ে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

'বাঁদর।' মাঝি জবাব দিল। 'বাঁদরের দল ওই দূরের গাছটার মাথায় রাতের মতো আড্ডা নিয়েছে। বাঁদর কাছে থাকলে ডর একটু কম থাকে। গাছের মাথা থেকে বাঁদরেরা ওনাদের দেখতে পেলেই হই চই শুরু করে দেয়। হরিণ, শুয়োর সব তখন সাবধানে গা ঢাকা দেয়। নৌকো বাঁদরের আড্ডা কাছাকাছি বাঁধলে ভয়ডর কম থাকে।'

রহিম বাওয়ালী খাঁড়ির দু-পাড়ে নেমে বিড়বিড় করতে করতে অনেকটা জায়গা ঘুরতে লাগল।

প্রদীপ জিজ্ঞেস করল, 'বাওয়ালী কী করছে?'

'আজ্ঞে কর্তা, ঘের দিয়ে আসছে।'

'তার মানে?'

'ঘেরের মধ্যে রাতের মতো আর ওনারা পা বাড়াবেন না।'

'কী? বাঘ?'

গহর মাঝি ধমকে বলল, 'বনের মাঝে ওনাদের নাম করতে নেই কর্তা।'

প্রদীপ হেসে উঠল, 'তোমার ওনারা তাহলে মানুষের মন্তরে বিশ্বাস করেন।'

বুড়ো গহর মাঝির চোখে একটু বেদনা-'কর্তা, বুনো মানুষ আমরা। জন্মো থেকে ওই বিশ্বাস করে আসছি। দেখছেন না — বাওয়ালী বনে যেতে কোনো অস্তর সঙ্গে রাখে না। বেঁচেও থাকে ওরা। খালি হাতে ওনাদের যে তাড়িয়ে দিতে পারে তার মন্তরে কিছু বল আছে বৈকি।'

বাওয়ালী আবার নৌকোয় এলো। কাঁধে তার গামছায় বাঁধা একবোঝা শুকনো কাঠ। মাঝি তখন নৌকো সামাল দিচ্ছে।প্রদীপ নিচু হয়ে কাঠের বোঝাটা মাথায় তুলে নিল। নিচু হতে গিয়ে তার পকেট থেকে একতাড়া নোট জলে পড়ে গেল। নিমেষে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাওয়ালী।

নৌকোয় উঠে এলে প্রদীপ হেসে বলল, 'বকশিস চাইলে না বাওয়ালী?'

বাওয়ালী একটু হাঁফাচ্ছিল। বলল, 'ওনাদের ঘর থেকে কত্তাকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বকশিস চাইব।'

নৌকো একটু পাড়ে রাখো মাঝি। একটু ডাঙায় নেমে পা দুটো খেলিয়ে নিই।' রাইফেলটা তুলে নিয়ে প্রদীপ বলল।

'ভর সন্ধেবেলা শুলোর ভেতর একা হাঁটতে যাবেন না কর্তা।'

হেসে প্রদীপ বলল, 'ঘের তো দেওয়া আছে, ভয় কী।'

নদীর পাড়ে চুপচাপ বসে ছিল প্রদীপ। ওরা কাঠ জ্বালিয়ে উনুন ধরিয়েছে। পড়ন্ত সূর্য আকাশে কত রঙের তুলি টেনে দিয়ে গেল। আশপাশ থেকে উচ্চিংড়ের একটানা ডাক। জলঘাসের ওপর কয়ার ফড়িঙের ক্রিং ক্রিং শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে। খাঁড়ির ওখানটা জল থিতোনো। মৃদু স্রোত একটু দূর দিয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে। সন্ধ্যার পৃথিবী উদাস শান্ত।

পরিষ্কার জলে কয়েকটা জলপাতার ওপর প্রদীপের নজর পড়ল। একটা পাতার ওপর একধারে একটা অদ্ভুত গোছের মাকড়সা বসে আছে। কালচে রঙ, পাগুলো সরু সরু। ভালো করে চেয়ে দেখে আশ্চর্য হল প্রদীপ। জলপাতাটার কাছে কয়েকটা ছোট ছোট মাছ ফরফর করে ঘুরছে। কিন্তু মাকড়সাটা ওখানে ওত পেতেছে কেন? হঠাৎ মাকড়সাটা টুপ করে জলে লাফিয়ে পড়ে ডুবে গেল। মাছগুলো বিদ্যুতের মতো ছিটিয়ে ছিটিয়ে গেল। আবার সব চুপ। মাছগুলো আবার জলপাতাটার কাছে ঘুরতে লাগল। বোধ হয় তারা পাতার গায়ের শ্যাওলাগুলো ঠুকরে খাচ্ছিল। এমন সময় সেই পাতার ডাঁটি বরাবর ভুস করে উঠে মাকড়সাটা একটা খুদে মাছের ঘাড়টা কামড়ে ধরল। চারটে পায়ে মাকড়সাটা পাতা আঁকড়ে ধরে আছে। তারপর একসময় টেনে পাতার ওপর তুলে মনের আনন্দে খেতে শুরু করল।

পড়ে কী বুঝলে?

১. গরানখালির খাঁড়ির দু-পাশে কী কী গাছ ছিল?

২. রাতের বেলায় বাঁদরেরা কোথায় আড্ডা দিত?

৩. প্রদীপ সেন কাকে বসশিস চাইতে বলল?

৪. অদ্ভুত মাকড়সাটি জলে কী খেতো?

দুটো গাছে গুনো দিয়ে বেঁধে নৌকো খাঁড়ির মাঝখানে। খাওয়া-দাওয়া শেষ। গহর মাঝি পেট ভরে খেয়েছিল প্রদীপের নেওয়া সরু চাল আর ঘি। বাওয়ালী কিন্তু ভালো খেতে পারল না। প্রদীপ জিজ্ঞেস করলে সে বলেছিল, 'দেহটা একটু ভারী হয়ে আছে।' বাওয়ালী শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি পাটাতনের ভেতর।

তারপরে গহর মাঝিও শুতে চলে গেল। প্রদীপ বসে আছে তখনও। কাঠের উনুনটায় ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কয়েকটা কাঠ-কয়লা জ্বলছে। চাঁদের আলোয় বন্য পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। এ যেন পৃথিবী নয়-অন্য কোনো গ্রহ। মাঝে মাঝে বনের ভেতর থেকে রহস্যময় শব্দ। নৌকোর গায়ের জলের ছলাত ছলাত শব্দ তাল দিচ্ছে।

হঠাৎ পাড়ের জলে মৃদু দুপদুপ শব্দ । সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা কোলে তুলে নিয়ে চাঁদের আলোয় প্রদীপ দেখল একদল বুনো শুয়োর জল খেতে নেমেছে। অনেকগুলো বাচ্ছা আর তাদের আগলে একটা ধাড়ি দাঁতাল মা।

প্রদীপের মাথায় দুষ্টুমি চেপে গেল। রাইফেলটা তুলে বন্দুকের ওপরের টর্চটা জ্বেলে দিল একটা তীব্র আলোর রশ্মি গিয়ে পড়ল শুয়োরগুলোর ওপর।

একটিমাত্র ক্ষিপ্র মুহূর্ত । শুয়োর-মা মৃদু একটা শব্দ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দলবল সমেত শুয়োরের দল ছুট লাগাল। বাচ্ছাগুলো আগে, পেছনে তাদের ধাড়ি মা। বেঁটে ল্যাজটা তার আকাশে তুলে হ্রস্ব উকারের মতো পাকানো।

রাত গভীর হল। নৌকোর ছইয়ের দু-ধার চটের পরদা দিয়ে ঢাকা। ভেতরে কালো অন্ধকার। হোল্ডঅলের বিছানাটার ওপর মাথা অবধি চাদর মুড়ি দেওয়া । আস্তে আস্তে একদিকের পর্দা একটু ফাঁক হতে থাকে। ঢুকে পড়ে ফিনকি দেওয়া একঝলক চাঁদের আলো। তারপর চাঁদের আলোকে আড়াল করে একটা কালো ভূতের মতো মূর্তি। আবার ছুঁচ-ফোটানো অন্ধকার।

পড়ে কী বুঝলে?

১. শিকারি প্রদীপ সেন দুপ্ দুপ্ শব্দের পর চাঁদের আলোয় কী দেখতে পেলো?

২. শিকারী রাতের অন্ধকারে কাকে বলে উঠল?
'নড়েছিস তো চোট করবো।'

হঠাৎ অন্ধকার চিরে টর্চের তীব্র একটা আলোর রেখা এসে পড়ল। বাজের মতো প্রদীপের কড়া গলা বেজে উঠল, 'নড়েছিস তো চোট করব।' প্রদীপের হাতের রাইফেল তাক করা রয়েছে। হোল্ডঅলটার ওপর গলার কাছে বলিষ্ঠ দুটো হাত দিয়ে চেপে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটা লোক। চোখে তার ভুত দেখার ভয়।

বুড়ো গহর লাঠি হাতে হুড়মুড় করে এসে ঢুকেই আল্লা আল্লা বলে ডেকে উঠল। 'বাওয়ালী তোমার এই কাজ?'

প্রদীপ কড়া গলায় বলল, 'সন্ধে থেকেই ওর মতলব আমার ভালো ঠেকেনি। সাবধান হয়ে ছিলাম হোল্ডঅলটাকে মানুষ শোয়ার মতো করে সাজিয়ে ছইয়ের কোণে জেগে বসে ছিলাম।'

'তোবা তোবা।' গহর বলে উঠল, 'সোঁদরবনে মোছলমানের নাম ডোবালি বাওয়ালী।'

হঠাৎ গহরের পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠল বাওয়ালী, 'লোভ সামলাতে পারিনি মিঞাজান। কর্তার পকেটে অতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারিনি। বাবুমশাইকে বলো আমার চোট করে দিক।'

আবার ডুকরে কেঁদে উঠল বাওয়ালী, 'মিঞাজান, তুমি তো জান! তুমি বাবুমশাইকে বলো এমন কাজ আমি জীবনে করিনি। শয়তান আমার মাথায় চেপে বসেছিল।'

গোঙাতে গোঙাতে কাঁদতে লাগল বাওয়ালী। এমন সময় মেঘের ডাকের মতো বাঘের গর্জন বন কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

ক্ষিপ্র পায়ে ছইয়ের বাইরে চলেএলো প্রদীপ। গহর মাঝি বলে উঠল, 'তোর পাপে তোর ঘেরের মন্তর কেটে গেছে বাওয়ালী।' আর কেউ কিছু বলার আগেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাওয়ালী। 'তা হলে ওনারা আগে আমাকেই নিক।'

গহর মাঝি চেঁচিয়ে উঠল, 'ফিরে আয় বাওয়ালী। ফিরে আয়। বাবুমশাই মাপ দিয়ে দেছেন,'

বঙ্গোপসাগরের একটা ঘূর্ণি হাওয়া বনে পাক দিয়ে ঝমঝমিয়ে চলে গেল।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই প্রদীপ দেখল কালকের গাছটার মাথা থেকে বাঁদরের দল অদৃশ্য । খাঁড়ির পশ্চিম পাড়ে বাঘের পায়ের খোঁচ পাওয়া গেল। একবার এসেছে, আবার ফিরে গেছে। বাতাস দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তৈরি হয়ে রাইফেলটা নিয়ে প্রদীপ পাড়ে নেমে গেল। গহর মাঝি সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, মানা করল প্রদীপ। হাতিয়ার ছাড়া এক বাওয়ালীই শিকারীর সঙ্গে যেতে পারে। ওরা খুঁজে দেখেছিল, কোথাও রক্তের দাগ নেই।

গুলোর ভেতর দিয়ে বাঘের পায়ের খোঁচ ধরে ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে প্রদীপ। রাইফেলের ঘোড়া তোলা আছে। নল সামনে বাগানো তৈরি। মাথার ওপর সবুজ বিদ্যুৎ হেনে টিয়াঝাঁক উড়ে গেল। সেদিক মন দেবার সময় নেই। মন তখন একাগ্র। কোথায় কোন দিক থেকে বাঘ আক্রমণ করবে জানাও যায় না। চারদিকে নজর রেখে সাবধানে এগোতে

লাগল প্রদীপ। সামনে একটা গোলপাতা গাছের ঝাড়। নারকেল গাছের যদি একদম গুঁড়ি না থাকত মাটি থেকেই যদি পাতা গজাত, তাহলে যেমন দেখতে হতো গোলপাতা গাছগুলো তেমনি দেখতে। খুব ঝাড় বেঁধে হয়। এপাশ ওপাশ নজরে আসে না। গোল ঝাড়টা ঘিরে সাবধানে এগোচ্ছে প্রদীপ। আর-এক পা গেলেই ও-ধারটা নজরে আসবে। আর পা বাড়িয়েই প্রদীপ জমে গেল। সামনেই ঢিপির নীচে বিরাট বাঘ। বোধহয় সবে ঘুম ভেঙেছে। প্রদীপকে দেখামাত্র দুপায়ে খাড়া হয়ে উঠে গোঁ-গর-গর করে একটা হুঙ্কার ছাড়ল। মুখটা বিরাট, ক্রুর। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

পড়ে কী বুঝলে?

১. খাঁড়ির কোন পাড়ে বাঘের পায়ের খোঁচ পাওয়া গেল?

২. মাথার ওপর সবুজ বিদ্যুৎ বেগে কী উড়ে গেল?

৩. বাঘের কোমর ভাঙলো কী করে?

পাকা শিকারী প্রদীপের মেরুদন্ড বয়ে একটা ভয়ের কাঁপুনি বয়ে গেল যেন। বাঘ আর তার মধ্যে মাত্র দশ-বার হাত তফাত। ওঠানো রাইফেল থেকে গুলি বেরোল না। আর বাঘের চোখ বন্দুকের নলের দিকে স্থির। নলটা বাঁ দিকে ঘোরে তো বাঘ ডান দিকে মাথা সরায়। প্রদীপ যেন সাপের চোখের সামনে পাখির মতো অজ্ঞান হয়ে গেছে।, বাঘ আবার একটা হুঙ্কার ছাড়ল। পেছনের পা দুটো তার টান হতে আরম্ভ হয়েছে।

হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল — 'ভয় নেই কর্তা, আমি এসে গেছি।' বলতে বলতে বাওয়ালী এসে পাশে দাঁড়াল। বাওয়ালীর হাতে কোনো অস্ত্র নেই। সে এসেই চোখ রাঙিয়ে বাঘকে গালাগালি আরম্ভ করল।

'খবরদার সুমুন্দির পো! এক পা এগিয়েছিস কি শেষ।'

বাঘ গরগরিয়ে উঠল। রহিম বাওয়ালীও বাঘের নকল করে গরগর করে উঠল। তারপর বাঘ একবার হুঙ্কার ছাড়ে তো সঙ্গে সঙ্গে বাওয়ালীও হুঙ্কার দেয়। আর তার সঙ্গে অনবরত গালাগালি। তারপর গালাগালির মতো করে রহিম প্রদীপকে বলল, 'এইবার সুমুন্দির শেষ। চোট করুন কর্তা, আর সময় নেই। এইবার লাফাবে সুমুন্দি।'

বাঘের চোখ থেকে তার চোখ একবারও নড়েনি। ঘোড়া টিপে দিল প্রদীপ। প্রচন্ড হুঙ্কার দিয়ে বাঘটা লাফিয়ে উঠেই মাটিতে পড়ে গেল। গুলি ঠিক লাগেনি। বাঘটার কোমর ভেঙে গেছে।

আর সে কী ভয়ঙ্কর রূপ বাঘটার! ভাঙা কোমর নিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে এগিয়ে আসতে লাগল বাঘটা। বাওয়ালী গালাগালি দিয়েই চলেছে আর বলছে, 'আবার চোট করুন শিগগির।"

কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস মূর্তির সামনে প্রদীপ তখন থরথর করে কাঁপছে। আর বাঘটা শনৈ শনৈ এগিয়ে আসছে তার দিকে।

আর যখন সময় নেই, বাওয়ালী প্রদীপকে আগলে তার হাত তুলে রাইফেলের ঘোড়া টিপে দিল। বাঘের প্রচন্ড থাবাটা তখন বাওয়ালীর মাথার ওপরেই পড়েছে। বাঘটা এক হাত ছিটকে লুটিয়ে পড়ল। আর বাওয়ালী টলতে টলতে ঘুরে পড়ল সেইখানে।

জেনে রাখো

খরস্রোতা	—	খুব বেগে
বিস্তৃত	—	বড়ো, ব্যাপক
অনড়	—	স্থির, যা নড়ে না
বিস্ময়	—	আশ্চর্য, চমৎকৃত ভাব বা অবস্থা
আদিম	—	অতি প্রাচীন, পুরনো
দিগন্তে	—	দিকের প্রান্তে, যেখানে আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিলেছে বলে মনে হয়।
সরীসৃপ	—	যে জীব বুকের সাহায্যে চলে
মাল্লা	—	জেলে (মাছ ধরে যে), নাবিক, মাঝি
মায়া কাজল মাখা	—	মায়া দয়া, মমতা
বদর	—	পীর, মহাপুরুষ, মুসলমান মাঝিরা জলযাত্রা নির্বিঘ্ন হওয়ার জন্যে এই পীরের নাম স্মরণ করে।
দ (মূল শব্দ দহ)	—	ঘূর্ণিজল
বাইনোকুলার	—	দূরবীক্ষণ যন্ত্র, যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরের বস্তু কাছে ও স্পষ্ট দেখা যায়।
সোঁদর বন	—	সুন্দর বনকে আঞ্চলিক ভাষায় সোঁদর বন বলা হয়েছে।
নোগ	—	মানুষ (গ্রাম্য ভাষা)
মায়া হরিণ	—	মাদী হরিণ অর্থাৎ স্ত্রী হরিণ। শিকারীরা স্ত্রী হরিণকে শিকার করে না। সুন্দর বন বাসীরা স্ত্রী হরিণকেই মায়া হরিণ বলে।
খাঁড়ি	—	সরু শাখা নদী, সাগর সংগমের নিকটবর্তী নদীর মোহানা
শূল	—	কাঁটা, বর্শা বা বল্লমের ফলকের মতো
তীক্ষ্ণ	—	সূক্ষ্মধার যুক্ত, ছুঁচালো।
অস্তর	—	অস্ত্র (গ্রামের ভাষা)
থিতানো	—	স্থির, যেখানে জল স্থির হয়ে থাকে।
হুমড়ি	—	উপুড় হয়ে পড়া, হামাগুড়ি।
হিঁচড়ে	—	জোর করে ঘষে ঘষে এগিয়ে যাওয়া।
শনৈ শনৈ	—	ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে।

লেখক পরিচয় —

সুকুমার দে সরকার (১৯০৯-১৯৭৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কিছুদিন মায়া ইন্‌জিনিয়ারিং কোম্পানীতে চাকরি করেন। পরে সি.এ. পাশ করে নিজস্ব অডিটিং ফার্ম স্থাপন করেন। কিন্তু সাহিত্য ছিল তার জীবনের মূল লক্ষ্য। নানা ধরনের গল্প লিখেছেন। তবে জীব-জগতের পশু পাখিদের নিয়ে সরস গল্প লেখায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়। শিশু ও কিশোর সাহিত্য রচনায় লেখকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। রামধনু, রংমশাল, মৌচাক, প্রভৃতি সে যুগের খ্যাতনাম্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন। পূজা বার্ষিকীতেও নিয়মিত তাঁর লেখা থাকতো। শিশু সাহিত্য পরিষদ তাঁকে 'ভুবনেশ্বরী পদক দিয়ে সম্মানিত করে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে জঙ্গলের গল্প, বনের গল্প ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঠ পরিচয় —

সুন্দরবন বলতে তার গভীর বন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্রের খাঁড়ি, সুন্দরী বা সুঁদুরী ও গরান গাছ, আর মাটিতে শূলের মতো উঁচু হয়ে থাকা শেকড় ছড়ানো গাছগুলি যাকে স্থানীয় কথায় শূলো ও ইংরেজিতে ম্যানগ্রেভের জঙ্গল বলে। এছাড়া নানাধরনের পশু-পাখি। কিন্তু এসব কিছু ছাপিয়ে সুন্দরবন বলতে বুঝি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অর্থাৎ হলুদ ও কালোয়

মেশানো ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের সমন্বয়ে শোভিত সুন্দরবনের বাঘ। তাদেরই অভয়ারণ্য, আর হয়ত সেইজন্য লেখক এই পাঠটির নাম দিয়েছেন 'বাঘ-বন।'

এই পাঠে একটি নৌকায় তিনটি মানুষ চরিত্র পাওয়া যায়। প্রথমত শিকারি প্রদীপ সেন। অকারণ জানোয়ার মারা তার উদ্দেশ্য নয়। লেখক তারই চোখ দিয়ে সুন্দরবনের প্রকৃতিকে দেখিয়েছেন। একটি পড়ন্ত বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে, একটি রাত ও পরদিন ভোর পর্যন্ত সুন্দরবনের আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা, পশু-পাখির এমনকি অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর নিখুঁত সজীব বর্ণনা, যা পড়তে পড়তে না দেখা সুন্দরবন চোখের সমানে ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয় চরিত্র বুড়ো গহর মাঝি, তার নৌকার আরোহী সুন্দরবনের নতুন অতিথি প্রদীপ সেনকে নিয়ে অতি সাবধানে ও অতি যত্নে নদী পথে এগিয়ে যায়। সন্ধ্যায় খাঁড়িতে নৌকা বাঁধে। রাতের খাওয়াটুকু সবাই সেরে নেয়। অতিথিকে সুন্দরবনের বাঘ সম্পর্কে বার বার সতর্ক করে দেয়।

তৃতীয় চরিত্র রহিম বাওয়ালী-তার চেহারার বর্ণনা ও পরিচয় লেখক দিয়েছেন। সে জেলে কিন্তু তার প্রধান পরিচয় ওঝা। এই সরল গ্রামবাসী হঠাৎ লোভের বশে অতিথির প্রাণনাশের চেষ্টা করতে যায়। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের প্রাণ দিয়ে অতিথির প্রাণ রক্ষা করে।

পাঠ বোধ

1. উপযুক্ত শব্দ বসাও।

   মাছগুলো, বনাঞ্চলে, মানিকজোড়, সরীসৃপ, শুয়োর

   ক) আদিম ..... অনড় কাঁচের মতো চোখগুলো দিগন্ত স্থির।

   খ) ..... পাখির উরুর কাছটায় অল্প সাদা লোম।

   গ) বাওয়ালী হল এই দখিন ..... বাঘের ওঝা।

   ঘ) ..... আবার জলপাতাটার কাছে ঘুরতে লাগল।

   ঙ) চাঁদের আলোয় প্রদীপ দেখল একদল বুনো..... জল খেতে নেমেছে।

সংক্ষেপে লেখো —

2. নদীর জলে ঝুকে পড়া কেওড়া গাছকে কী মনে হচ্ছে।
3. কাদার উপর পড়ে থাকা কুমিরের ছোট্ট অথচ নিখুঁত বর্ণনা 'বাঘ-বন' পাঠ অবলম্বনে লেখো।
4. 'বাঘ-বন' গল্পে মাঝিটির নাম কি ছিল?
5. লেখকের দৃষ্টিতে হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে ছুঁচিবাই বুড়ির মতো কারা হাঁটছিল?
6. মায়াহরিণকে সুন্দরবনবাসীরা কেন শিকার করে না?
7. বাঘ-বনে বাঁদরের কাছে থাকলে ভয় কম থাকার কারণ কী?
8. 'তা হলে ওনারা আগে আমাকেই নিক।' 'ওনারা' কারা? কথাটি কে বলেছে?
9. লেখকের বর্ণনায় সুন্দরবনের গোলপাতা গাছগুলো কেমন দেখতে লাগছে লেখো।

বিস্তারিতভাবে লেখো —

10. পাঠের নাম বাঘ-বন কেন রাখা হয়েছে? তোমার কী মনে হয় তা নিজের ভাষায় লেখো।
11. পড়ন্ত বেলায় নৌকার ওপর থেকে সুন্দরবনের সৌন্দর্যের বর্ণনাটি 'বাঘ-বন' পাঠ অবলম্বনে লেখো।

12. 'তোর পাপে তোর ঘেরের মন্তর কেটে গেছে বাওয়ালী' উক্তিটি কার? রহিম বাওয়ালী কোন পাপ করেছিল? তারজন্য সে কোথায় গেল?
13. 'বাঘ-বন' পাঠটিতে লেখক কোন্ কোন্ প্রাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন? সেইসব প্রাণীর নাম লেখো।
14. "ভয় নেই কর্তা, আমি এসে গেছি।" বলতে বলতে বাওয়ালী এসে পাশে দাঁড়ালো"। উক্তিটিতে কর্তা কে? বাওয়ালী কীভাবে তাকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করলো? ঘটনাটির বর্ণনা তুমি নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে বদলাও

রূপো —	সময় —
সুন্দর —	মাঠ —
জল —	বন —
পৃথিবী —	ভূত —

2. লিঙ্গ পরিবর্তন করো

বাঘ —	হরিণ —
সিংহ —	কর্তা —
অশ্ব —	বুড়ো —

3. সন্ধি করো

সু + আগত	সপ্ত + ঋষি
মহা + উৎসব	দিক্ + বিজয়
অভয় + অরণ্য	দিক্ + অন্ত
সম্ + বাদ	

বাংলার লোকনৃত্য

শান্তিদেব ঘোষ

বিষয় প্রসঙ্গ ঃ গ্রামাঞ্চলের পুরুষ ও নারীদের জন্য নৃত্যগুলি সাধারণত দলবদ্ধ ভাবে করা হয়ে থাকে। গ্রাম্যসমাজের নানাধরনের উৎসব ও অনুষ্ঠানকে ঘিরে এই নাচগুলির সৃষ্টি।

চড়ক উৎসবে বাংলার নানা অঞ্চলে দশাবতার নৃত্য, ধূপনৃত্য, ফুলসন্যাস, শ্লোক, চালন, বায়েল ইত্যাদি নানারকম নাচ খুবই প্রচলিত ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে লাঠি, হাতে রুমাল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দলবদ্ধ নাচের রীতি এখনও প্রচলিত।

বাংলার গ্রামে বিবাহ, ব্রত, পুজোকে কেন্দ্র করে মেয়েদের মধ্যে অনেকরকম নাচ প্রচলিত ছিল। এইসব লোকনৃত্যের মধ্যে কোনো জটিলতা ছিল না, সহজ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়। এই ধরনের নাচগুলির সঙ্গে ঢোল, করতাল, মাদল, সানাই, বাঁশি ইত্যাদি অনেকরকম বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত।

পশ্চিমবাংলায় কোথাও কোথাও পুতুলনাচের প্রচলন আছে। দুই-ফুট, আড়াই ফুট উঁচু বাঁশের লাঠির ডগায় এগুলি বাঁধা থাকে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে পুতুল তৈরি হয়। পুতুলগুলি যেন মানুষের মতো অঙ্গভঙ্গি করে অভিনয় করে।

আদিবাসী সমাজের মধ্যেও অনেকরকম নাচ আছে। শান্তিনিকেতনে উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের ফলে লোকনৃত্যের কিছু অঙ্গভঙ্গি শিক্ষিত সমাজ গ্রহণ করে। নৃত্যশিল্পী গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী নৃত্য প্রচারে বিশেষ সচেষ্ট হন, তবে তা বিশেষ প্রসার লাভ করেনি।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে এক রকমের নাচ বহু যুগ ধরেই চলে আসছে। সেগুলি কোনো পেশাদারি নাচ নয়। সে সবই হল গ্রামসমাজের সকলের নাচ।, একেই আজকাল আমরা লোকনৃত্য বলছি। এই নাচের অধিকাংশই হচ্ছে দলবদ্ধ নাচ তা সে পুরুষেরই হোক বা নারীদের জন্যেই হোক। গ্রামসমাজের নানাপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠানকে ঘিরে এই নাচগুলির উৎপত্তি।

বাংলাদেশের বর্ষশেষের উৎসব হল চড়কপূজার উৎসব। ওই দিনে বাংলার নানা অঞ্চলে দশাবতার নৃত্য, ধূপনৃত্য, ফুলসন্যাস, শ্লোক, চালন এবং বায়েল নামে কতকগুলি নাচ এক যুগে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এ নাচগুলিতে পুরুষরাই অংশ নিত। আজকাল দশাবতার নৃত্য বাংলায় আর বড়ো দেখা যায় না, কিন্তু বড়ো ধূপদানি হাতে ধূপনৃত্যের নমুনা দেখা যায় পুরুষদের মধ্যে দুর্গাপূজার উৎসবে। শ্লোকনৃত্য হত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নানাপ্রকার কবিতা ছড়ার মতো করে সহজ সুর ও ছন্দের গানের সঙ্গে। এসব নাচ কথাকলি বা ভরতনাট্যমের মতো। মুদ্রাভিনয়ের নাচ নয়। আঙ্গিকের দিক থেকে এ নাচ খুব উঁচুদরেরও ছিল না। অধিকাংশ নাচের সঙ্গে বাজত বড়ো ঢাক ও কাঁসির তাল। লাঠি হাতে বা রুমাল হাতে দলবদ্ধ নাচ পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের বীরভূম জেলার রায়বেঁশে হল প্রাচীন যোদ্ধাজাতির একপ্রকার পুরুষনৃত্য। আজও তার কিছু কিছু বেঁচে আছে। খালি হাতে, ঢাল তলোয়ার হাতেও এদের নাচতে দেখা যেত। এই নাচের সঙ্গত হল কেবলমাত্র ঢাল ও কাঁসির তাল। মহরমের উৎসবে মুসলমানদের মধ্যে লাঠি ঢাল তলোয়ার ইত্যাদি নানাপ্রকার অস্ত্র হাতে নাচের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। বাংলাদেশের পুরুষদের বড়ো পূজার ঢাক নিয়ে একসঙ্গে ধর্মপূজার উৎসবের রাত্রিতে একতালে ও এক ভঙ্গিতে নাচতে দেখেছি।

পড়ে কী বুঝলে ?

১. বাংলার গ্রামসমাজে উৎসব অনুষ্ঠানে কোন কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো হোত ?

২. বাংলাদেশে বর্ষশেষের উৎসব কী ? ঐ দিন কী কী নাচের প্রচলন ছিল ?

৩. কোন উৎসবে নাচের সঙ্গে লাঠি, ঢাল, তলোয়ার ব্যবহার হয় ?

এক সময় বাংলাদেশের গ্রামে মেয়েদের মধ্যে নানাপ্রকার ব্রত, পূজা, অনুষ্ঠান ও বিবাহাদি উৎসবে নাচের বিশেষ

প্রচলন ছিল। বর্ষার প্রথম দিনে মেয়েরা গান গেয়ে আঁচল ধরে ঘুরে ঘুরে নাচত। মাঘ মাসে কুমারী মেয়েরা মাঘমণ্ডল ব্রতের সময় খুব ভোরে ফুল গাছের চারদিকে ফুল ছড়িয়ে ব্রতগান গেয়ে নাচত। গ্রামের বিবাহ অনুষ্ঠানে বয়স্ক ও কুমারী মেয়েরা নিজেদের মধ্যে গানে ও নাচে মেতে উঠত। 'গঙ্গা পূজা' নামে বিয়ের অনুষ্ঠানে স্নান করানোর সময় ধুনুচি নিয়ে গান গেয়েও নাচত। এভাবে অনেকগুলি স্ত্রী-আচারে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে গান ও নাচের চলন ছিল।

পড়ে কী বুঝলে?

১. মাঘ মাসে কোন গান গাওয়া হয়?

২. গঙ্গাবরণ নৃত্য কোন অনুষ্ঠানে হয়?

৩. বিয়ের অনুষ্ঠানে স্নান করানোর সময় কী নিয়ে গান গেয়ে নাচা হয়ে থাকে?

মেয়েদের এইসব নাচ মুদ্রাভিনয়ের মতো জটিল আঙ্গিকের নাচ নয়। এ হল গানের ছন্দে, ঢোল ও কাঁসির তালে তাল মিলিয়ে সহজ অঙ্গবিক্ষেপ ও পদ-চালনার নাচ।

এ ছাড়া পুরুলিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে পুরুষ ও মেয়েদের যত রকমের উৎকৃষ্ট লোকনৃত্য দেখেছি, তার পরিচয় দেশবাসীর ভালো করে জানা নেই। এর প্রচারে লোকনৃত্য জগতে বাংলার গৌরব যে খুবই বেড়ে যাবে এ বিষয়ে আমি

নিঃসন্দেহ।

পশ্চিমবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গ্রামবাসী পুরুষেরা 'ভাদু' 'টুসু' নামে কোনো এক প্রাচীন রাজকুমারীর কথা স্মরণ করে নিজেরা গান রচনা করে ও রাস্তায় রাস্তায় ঢোল ও করতালের তালে তা গেয়ে বেড়ায়। এই সঙ্গে থাকে মেয়ের সাজে একটি বালক। কোমর দুলিয়ে সে ঢোল ও করতালের তালে তালে পা ফেলে গানের সঙ্গে নাচে। কিন্তু এ নাচ অভিনয়-নৃত্য নয়। পায়ের ছন্দের দিকে থাকে সব ঝোঁক।

পশ্চিমবাংলায় একরকমের পুতুলনাচ দেখতে পাই। এই পুতুলগুলি আকারে দু-ফুট থেকে আড়াই ফুটের মতো উঁচু। এগুলি লম্বা বাঁশের লাঠির ডগায় বাঁধা থাকে। পুতুলের হাত, মুখ, পায়ের সঙ্গে থাকে কালো সুতো বাঁধা। এক মানুষ উঁচু একটি পর্দার আড়ালে দর্শকদের উলটোদিক থেকে পুতুলগুলি নাচানো হয়। যারা পর্দার আড়ালে থেকে তাদের

নাচায় দর্শকরা তাদের দেখতে পায় না। প্রত্যেক পুতুলের জন্যে স্বতন্ত্র একজন মানুষ থাকে। পুতুলের ডান্ডাটির অপরদিক এদের কোমরের সঙ্গে বুকের দিকে বাঁধা থাকে। প্রত্যেক পুতুল তৈরি হয় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে। কারণ পুতুলনাচের বিষয়বস্তু ওই কটি প্রাচীন সাহিত্য থেকে গৃহীত হয়। ঢোল, সানাই ও কাঁসার করতালের ছন্দে হয় অভিনয়-নৃত্য । কখনো কখনো পাত্র-পাত্রী অনুযায়ী কথাও বলে নীচের মানুষেরা। তারাই বাজনার তালে তালে সুতো টেনে পুতুলের অঙ্গভঙ্গি ভাবানুযায়ী পরিচালনা করে। সামনে থেকে দেখে মনে হবে পুতুলগুলি যেন মানুষের মতনই অঙ্গ ভঙ্গি করে অভিনয় ও নাচ করবার চেষ্টা করছে। নাচের সময় বা অভিনয়ের সময় জায়গার বদল করতে হয়, চলতে ফিরতে হয়। এ সবই নীচের মানুষের দ্বারাই করা হয়। তারাই চলে ফেরে ও জায়গা বদল করে।

পড়ে কী বুঝলে?

১. পশ্চিম বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুরুষেরা কোন রাজকুমারীর কথা স্মরণ করে গান রচনা করে?

২. পুরুলিয়ার কোন নাচ পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত?

৩. কোন সমাজে উৎসব অনুষ্ঠানে নাচ অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ?

পুরুলিয়ার বাংলাভাষী অঞ্চলে আজও 'ছৌ' নাচ পুরুষদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলিই ওই নৃত্যাভিনয়ের প্রধান বিষয়। ঢাকের তালে ও সানাইয়ের সুরে এ নাচ সম্পন্ন হয়। নৃত্যাভিনেতারা নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মতো যেখানে যার প্রবেশ ও প্রস্থান দরকার তা করছে, কিন্তু সবই নাচের ছন্দে ও নৃত্যভঙ্গিতে। আজকাল সাজপোশাকে আগের যুগের থিয়েটার বা যাত্রার প্রভাব রয়েছে পূর্ণভাবে। গান থাকে না। অঙ্গভঙ্গির দ্বারা ভাব ব্যক্ত করে মাত্র । নাচের ভঙ্গি খুবই পৌরুষব্যঞ্জক। স্ত্রী চরিত্রগুলি ছেলেদের দ্বারাই অভিনীত হয়। অভিনয়ের গোড়াতে একজন সূত্রধর গণেশের বন্দনাগান করার পর গানের সুরে ও ছন্দে অভিনয়ের গল্পটি বলে যায়, তার পরে শুরু হয় নাচ। এই নৃত্যে মুখোশ ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের বৃহৎ সংখ্যার আদিবাসী সমাজের মধ্যে নাচ প্রচুর। বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মেয়েদের নাচ। নাচ তাদের সমাজের যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এদের গান, তাল ও নাচের ভঙ্গির সঙ্গে বাংলার অন্যান্য গ্রামসমাজের নাচের মিল খুবই কম। এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের নাচ। পেশাদারী একক নাচ নেই। দলবদ্ধ নাচই এরা করে। গানের সঙ্গে বেশির ভাগ নাচে মেয়েরা। সঙ্গে তাদের সঙ্গত হল মাদল, নাকাড়া, বড় কাঁসার করতাল ও বাঁশের বাঁশি । পুরুষদের নাচে গানের চেয়ে বাদ্যযন্ত্র অধিক ব্যবহৃত হয়।

এ যুগের শহরবাসী শিক্ষিতদের মধ্যে গ্রামীণ নৃত্যকলার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে, তাঁর শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা ১৯২৯ সালে উদয়শঙ্কর-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ-নৃত্যের কতগুলি ঢং নতুনরূপে শিক্ষিতদের মনোহরণ করে। অনেকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওইপ্রকার গ্রামীণ নাচের চর্চায় মনোযোগী হয়।

১৯৩১ সালে বাংলার শিক্ষিতদের মধ্যে আর একটি নৃত্য আন্দোলনের সূত্রপাত হল গুরুসদয় দত্তের দ্বারা। তিনি ছিলেন সে যুগে একজন আই.সি.এস. ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর নৃত্য আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মৃতপ্রায় নৃত্যগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা, এঁরই উৎসাহে বীরভূমের রায়বেঁশে, ঢালিনৃত্য, ময়মনসিংহের মুসলমান সমাজের 'জারি' নৃত্য ও কয়েকপ্রকার ব্রতনৃত্য শিক্ষিতসমাজে বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠে। ইনি বাংলার বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ব্রতচারী নৃত্যের প্রচারের বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষক তৈরির বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয় তাঁর চেষ্টায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে আন্দোলনের প্রসার ধীরে ধীরে কমে আসে। সামান্য কয়েকটি কেন্দ্রে এখনও ব্রতচারী নৃত্যের কিছু চর্চা হয়।

শহরবাসী শিক্ষিতসমাজে গ্রামীণ দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্যের আদর্শে নাচের প্রচলন হোক—গুরুদেব ও গুরুসদয় দত্ত উভয়েই বিশেষভাবে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলনের সূত্রপাত চল্লিশ বৎসর পূর্বে শুরু হলেও এ সমাজে তেমন ব্যাপকভাবে এখনো তা প্রসার লাভ করেনি।

একমাত্র বৃক্ষরোপন উৎসব ও দোল উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে ও বনমহোৎসবের সময় বাংলার দু-এক জায়গায় তা দেখা যায়।

জেনে রাখো

ব্রতচারী	—	ছেলেমেয়েদের দলবদ্ধভাবে লোকনৃত্য। যা গুরুসদয় দত্ত প্রচলিত করেন।
আঙ্গিক	—	অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা প্রকাশ করা, অভিনয়।
ধুনুচি	—	ধূনা জ্বালাবার পাত্র।
স্বতন্ত্র	—	আলাদা
পেশাদারি	—	টাকা নিয়ে কাজ করা।
সূত্রপাত	—	শুরু, আরম্ভ ।
আন্দোলন	—	আলোড়ন, দোলানো, বিক্ষোভ।

লেখক পরিচয় —

শান্তিদেব ঘোষ (১৯১০-১৯৯৯) ছ' মাস বয়সে বাবা-মার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসেন। পড়াশোনা বেশিদূর এগোয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় নাচ গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে তা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে । ১৯-২০ বছর বয়স থেকেই বিশ্বভারতীতে নৃত্য গীত অভিনয়ের কাজে যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে নানা ঘরানার নৃত্য গীতের চর্চা করেন এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ভারতে মণিপুর, কেরল, তামিলনাড়ু যান। বিদেশে জাভা, বালি, ব্রহ্মদেশ, সিংহলে যান। সেখানকার নৃত্য গীত শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য স্বরলিপিকার, সংগীত শিক্ষক, ও গায়ক। সুরকার রূপেও তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের পরিচালক ও পরবর্তী কালে অধ্যক্ষ হন। প্রতিভার স্বীকৃতি রূপে তিনি রাশিয়ার পদক পান। বিশ্বভারতী থেকে সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম', বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী থেকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলাউদ্দীন পুরস্কার পেয়েছিলেন। ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ ও তিনি লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য রচনা রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা, ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি, রূপকার নন্দলাল, রবীন্দ্র সম্পূর্ণ শিক্ষাদর্শে সংগীত নৃত্য ও অভিনয়ের স্থান। জীবনীমূলক রচনা জীবনের ধ্রুবতারা।

পাঠ বোধ

1. খালি জায়গায় ঠিক শব্দটি লেখো —

ক) বাংলা দেশের বর্ষশেষের উৎসব হলো ..... উৎসব।

ক) চড়ক পূজার খ) কৃষ্ণলীলা বিষয়ক

গ) ধর্মপূজার ঘ) বৃক্ষরোপন

খ) নৃত্য শিল্পী গুরুসদয় দত্ত ..... নৃত্য প্রচারে বিশেষ সচেষ্ট হন।

ক) ভরতনাট্যম্ খ) কথাকলি

গ) রায়বেঁশে ঘ) ব্রতচারী

গ) পুতুল নাচের পুতুলগুলি আকারে ..... থেকে আড়াই ফুটের মতো উঁচু।

ক) এক ফুট খ) দেড় ফুট

গ) দু ফুট ঘ) সওয়া ফুট

সংক্ষেপে লেখো —

2. লোকনৃত্য কাকে বলে?
3. বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সমাজে কী কী ধরনের লোকনৃত্য প্রচলিত ছিল?
4. কয়েকটি শাস্ত্রীয় নৃত্য ও কয়েকটি লোকনৃত্যের নাম লেখো।
5. বীরভূম জেলার প্রাচীন পুরুষনৃত্যের নাম কি? কিভাবে তারা নাচত?

বিস্তারিতভাবে লেখো —

6. পুরুলিয়ার প্রসিদ্ধ ছৌ-নাচ সম্পর্কে যা জানো তা বিস্তারিতভাবে লেখো।
7. বাংলা দেশের গ্রামে মেয়েদের মধ্যে পূজা, ব্রত, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে কী কী নাচ প্রচলিত ছিল? এ সম্পর্কে লেখো।
8. বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজ বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নাচ সম্বন্ধে যা জান 'বাংলার লোকনৃত্য' পাঠ অবলম্বনে লেখো।
9. শান্তিনিকেতনের দোল উৎসব ও বৃক্ষরোপন উৎসব সম্বন্ধে লেখো।
10. ব্রতচারী নৃত্য আন্দোলন কবে কার নেতৃত্বে শুরু হয়? এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্রতচারী নৃত্যের মধ্যে কোন কোন লোকনৃত্যের প্রভাব দেখা যায়? লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিজের শব্দগুলি দিয়ে বাক্যরচনা করো ঃ-
   ক) ভঙ্গি
   খ) ধুনুচি
   গ) পেশাদারি
   ঘ) সূত্রপাত
   ঙ) আন্দোলন
2. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ-
   (ক) বহু
   (খ) পুরুষ
   (গ) তাল
   (ঘ) শিক্ষিত
   (ঙ) গৌরব
3. কারক কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক কারকের একটি করে উদাহরণ দাও।
4. সন্ধি করো ঃ-
   ক) দশ+ অবতার
   খ) যা + ইচ্ছা + তাই
   গ) মহা+ উৎসব
   ঘ) বদ + জাত
   ঙ) অধিক + অংশ
5. নিচের শব্দগুলি আলাদা করে লেখো ঃ—
   ক) বিন্ধ্যারণ্য
   খ) ভাবানুযায়ী
   গ) ছোড়দাদা
   ঘ) সচেষ্ট
   ঙ) মুদ্রাভিনয়

পদ্য

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পড়ার আগে ভাবো

নিজের জননী আর জন্মভূমির মতো নিজের মাতৃভাষা ও তোমার আমার সকলের কাছেই খুব প্রিয়। বঙ্গভাষার (বাংলা ভাষা) অমূল্য সম্পদকে অবহেলা করে বিদেশী ভাষার দ্বারস্থ হওয়া কি নিজেরই অপমান নয়? একথা তোমরা ভেবে দেখেছ কি?

হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মন;,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা, ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

কবীর

কালিদাস রায়

কবে তব আবির্ভাব, কবে তব হলো তিরোধান —
কিছু তার নাহি জানি। গণিতের অঙ্কপরিমাণ
তোমারে বাঁধিতে নারে কোন ইতিহাসের পাতায়।
তব জাত-পত্রখানি নাহি মিলে কালের খাতায়।
তুমি চিরদিনকার, নহ তুমি কোন শতাব্দীর;
গোষ্ঠীহারা, কোষ্ঠীহারা, গোত্রহীন হে সাধু কবীর।
কালসিন্ধু মাঝে তব জীবনের নাহি পাই সীমা —
মহাসিন্ধুময় হয়ে আছে তার বিশাল মহিমা।
কেবা তব পিতামাতা-তার মোরা পাইনি সন্ধান।
তুমি নারদের মতো বিধাতার মানস-সন্তান।
সংসার-সন্ন্যাস ভেদ যাঁর মাঝে পাইল বিলয়
গৃহী, কি বৈরাগী তিনি কেমনে তা হইবে নির্ণয়?
জানি না, কি ছিলে তুমি ধর্মরাজ্যে সহজী মরমী,
রামাত বৈষ্ণব সুফি বৌদ্ধ জৈন কিংবা বর্ণাশ্রমী,
কতটা মোসলেম ছিলে,কতটা বা হিন্দু নাহি বুঝি;
কুড়ানো ছেলের আর পিতৃধর্ম কোথা পাব খুঁজি?
কোন সম্প্রদায় তোমা জাতিহারা, ভাবেনি আপন,
মহামানবের ছিলে, তারি ধর্ম করেছ পালন।
জানি না জীবন-কথা । কি কি ভাবে করিলে সাধনা
জানি না করিলে কারে কি প্রথায় পূজা আরাধনা।
গড়েছিলে সম্প্রদায় জানি নাকো কি বিধি-বিধানে,
তাহার প্রতীক বেশ জীবযাত্রা কি ছিল, কে জানে?
কোন গ্রন্থ পড়েছিলে, কোন মন্ত্র জপিতে ধীমান?
কত বার? কি আসলে কতক্ষণ করিতে ধেয়ান?
তব দীর্ঘ জীবনের বহিরঙ্গ কোন পরিচয়
করিয়া রাখেনি হায়, ইতিহাস অমর অক্ষয়।
সমস্ত জীবনখানি নিঙাড়িয়া দিয়াছ যে বাণী
তার এক বর্ণ মোরা হারাইনি — এই শুধু জানি।
ব্যাপ্ত হলো দিগ্বিদিকে স্নেহবিন্দুসম খরস্রোতে,
বঞ্চিত হইনি তব জীবনের সার ধন হতে।
ভারতের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়ে অনুস্যূত
তব ব্রত, তব মন্ত্র চিরদিন তার অঙ্গীভূত।
কলামূর্ত করি তারে ইতিহাস গম্বুজ মিনারে
নমস্য করিয়া রাখি আপনার দায়িত্ব না সারে।*

জেনে রাখো

তিরোধান	—	মৃত্যু
নারে	—	না পারা (কবিতার ভাষা)
গোষ্ঠীহারা	—	জাতিহারা, কুলহারা, বংশহারা, দলহারা।
কোষ্ঠীহারা	—	গোত্রহীন, কুল বা বংশে নেই যার। (কোষ্ঠীর অর্থ - জন্ম পত্রিকা, যাতে জন্মের সময়ের রাশি, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান দেখে মানুষের জীবনের শুভ অশুভ বিচার করা হয়।) জন্মের দিনক্ষণ না জানা।
কালসিন্ধু	—	সিন্ধু অর্থাৎ সমুদ্রের মত বিস্তারিত কাল বা সময়।
মানস-সন্তান	—	মন বা কল্পনায় জন্ম যে সন্তানের।
বিলয়	—	বিনাশ, ধ্বংস
গৃহী	—	গৃহে থাকে যে।
বৈরাগী	—	সন্ন্যাসী, সংসারে অনাসক্ত
সহজী	—	সহজ মতে যে সাধনা।
মরমী	—	মর্ম উপলব্ধি করে এমন, দরদী।
বৈষ্ণব	—	বিষ্ণুর উপাসক।
সুফি	—	(Mystic) মুসলমানধর্ম সম্প্রদায় বিশেষ।
বর্ণাশ্রমী	—	ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারটি আশ্রমধর্ম যে পালন করে।
ধীমান্	—	জ্ঞানী (ধী-এর অর্থ বুদ্ধি, জ্ঞান)
ধেয়ান	—	ধ্যান (কতির ভাষা)
বহিরঙ্গ	—	বাহিরের অঙ্গ (বাহ্য অঙ্গ)
নিঙাড়িয়া	—	নিংড়ান (কবিতার ভাষা)
ব্যাপ্ত	—	বিস্তৃত
রন্ধ্রে	—	ছিদ্রে গর্তে।
অনুস্যূত	—	অবিচ্ছিন্ন
অঙ্গীভূত	—	অন্তর্গত
কলামূর্ত	—	(কলা শিল্প, মূর্ত-স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ) প্রত্যক্ষ শিল্প।
গম্বুজ	—	মন্দির বা প্রাসাদের উপরে গোল ছাদ।
মিনার	—	অট্টালিকা বা মন্দিরের খুব উঁচু চূড়া।
নমস্য	—	নমস্কারের যোগ্য, পূজনীয়।
নারদ	—	ব্রহ্মার মানস পুত্র।

কবি পরিচিতি

কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) সারা জীবন শিক্ষকতা করেছেন। রবীন্দ্রযুগে যাঁরা প্রচলিত কাব্যধারায় সমর্পিত থেকেও স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাদের মধ্যে কালিদাস রায় অন্যতম। ইনি কাব্য আঙ্গিকে কোন প্রথা ভাঙ্গা পরীক্ষা নিরীক্ষার কষ্টসাধ্য পথের পথিক হননি ঠিকই কিন্তু সহজ সরল ভাবনায় সমৃদ্ধ তাঁর কবিতাগুলি সাধারণ পাঠকের প্রশংসা অর্জনের পাশাপাশি রসিক মহলেও স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর কবিতায় মানবীয় সংবেদনার স্পর্শ আছে। মানুষের কল্যাণে যা কিছু ভালো বা আদর্শ সৃষ্টিকারী বিষয়, সেই ভাবনায় আপ্লুত হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় কাব্য-ব্যঞ্জনার রবীন্দ্র সদৃশ্য অভিব্যক্তি না থাকলেও কাব্যধর্মিতার অভাব নেই। কবিতা ছাড়াও সাহিত্য ধর্মী অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৮ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুন্দ' প্রকাশিত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্য - কিশলয়, পর্ণপুট, ক্ষুদকুঁড়া, পূর্ণাহুতি, ব্রজরেণু, রসকদম্ব, লাজাঞ্জলি, হৈমন্তী, সন্ধ্যামণি ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিনী স্বর্ণপদক, বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। পূর্ণাহুতি কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

কাব্য পরিচয়

এই কবিতাটির মধ্যদিয়ে কবি কালিদাস রায় পরমপুরুষ কবীরের জীবনের একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁর জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখ লিখিত নেই। জন্ম, জাতি, কুল, পিতৃ-মাতৃ পরিচয়-হীন সাধু কবীরের সমুদ্রের মতো সীমাহীন জীবনের মহিমা বিচার করা যায়না। এখানে কবি কবীরকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, নারদ যেমন ব্রহ্মার মানস পুত্র ঠিক তেমনই কবীরও ঈশ্বরের মানস পুত্র। তাঁর জীবন যেন গৃহী ও সন্ন্যাসীর মিলন ভূমি। জগতে ধর্মক্ষেত্রে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে কবীর কোন মতবাদের অনুসরণ করেছেন তাও জানা যায় না, এমনকি কীভাবে কোন সাধনায় মগ্ন থেকে এতবড় সাধক হলেন ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু সাধনায় পাওয়া তাঁর অনুভূতির বাণীরূপ আজ সমগ্র ভারতবাসী গ্রহণ করেছে।

কাব্যের শেষে কবি জানিয়েছেন, যেমন করে অট্টালিকা বা মন্দিরের উঁচু চূড়াকে গম্বুজের আকৃতি দিয়ে ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করা হয় তেমনি করেই কবিও এই ছন্দের মধ্যদিয়ে কবীরের জীবন ও বাণীকে ইতিহাসে অমর করে রাখতে চেয়েছেন।

পাঠ বোধ

1. পাশে বন্ধনীর মধ্যে থেকে বেছে সঠিক অর্থটি লেখো
   (ক) বিলয় (বিনাশ, বিলাপ, বিকাশ)
   (খ) বৈরাগী (সন্ন্যাসী, ভিখারী, খুবরাগী)
   (গ) ধীমান (ধার্মিক, জ্ঞানী, ধনবান)
   (ঘ) রন্ধ্র (বন্ধন, ছিদ্র, রৌদ্র)

সংক্ষেপে উত্তর দাও

2. গোষ্ঠীহারা শব্দটির অর্থ লেখো।
3. কোষ্ঠীহারা বলতে কী বোঝ লেখো।
4. মরমী কাকে বলে?
5. মিনার কী?
6. নারে, ধেয়ান, নিঙাড়িয়া এগুলি কবিতার ভাষা, মূল শব্দটি লেখো ।
7. নারদ কে?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

8. বর্ণাশ্রমী বলতে তুমি কী বোঝ লেখো।
9. সহজী, রামাত, বৈষ্ণব, সুফি, বৌদ্ধ, জৈন এই প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায়গুলির বিষয়ে এক একটি বাক্যে উত্তর দাও।
10. ইতিহাসের পাতায় কবীরের নামের উল্লেখ কেন নেই? 'কবীর' কবিতাটি অবলম্বনে লেখো।
11. 'কবীর' কবিতাটি তোমরা পড়েছ। সাধক কবীর সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা হোল? কবিতাটি অবলম্বনে খুব সংক্ষেপে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. সন্ধি করো
   শত + অব্দ, সম্ + সার, বর্ণ + আশ্রম, বহিঃ + অঙ্গ

2. ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখো

শতাব্দ, পিতামাতা, কালসিন্ধু

3. বিপরীত শব্দ লেখো

সাধু	গৃহী	ধর্ম
আপন	জীবন	বহিরঙ্গ

4. এক কথায় লেখো

(ক) গৃহে থাকে যে (খ) নমস্কারের যোগ্য

(গ) বিষ্ণুর উপাসক (ঘ) মর্ম উপলব্ধি করে যে

(ঙ) সহজ মতে যে সাধনা (চ) সংসারে অনাসক্ত

একটি ভাবার্থের নমুনা

....."গণিতের অঙ্কপরিমাণ

তোমারে বাঁধিতে নারে কোন ইতিহাসের পাতায়"

কোন ঘটনা বা ব্যক্তি চরিত্র তখনই ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় যখন অঙ্কের নিয়ম অনুসারে সেই ঘটনার নির্দিষ্ট সময় বা কোনো ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর নির্দিষ্ট সন তারিখ উল্লিখিত থাকে। কবীরের জন্ম-মৃত্যুর কোনো নির্দিষ্ট সন তারিখ পাওয়া যায় না তাই তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি।

জেনে রাখো (পরিচয়)

কবিতায় তোমরা পড়েছ কবীরের জন্ম বা মাতাপিতা, বংশ এসবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি নিজে কোথাও উল্লেখ করেননি। তবে অনুমান করা হয় সম্ভবত ১৪০৪ খৃ: কাশীধামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো মতে ১৩৯৮ খৃ: এক মুসলমান দম্পতি নিরু ও নীমার পালিত পুত্র কবীর। ১৫৯৮ খৃ: গোরক্ষপুরের কাছে বস্তি জেলার মাঘার নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কবীরকে তাদের ধর্মমতের সাধক বলে উল্লেখ করে। ধর্ম সম্বন্ধে কবীর বলেছেন — "প্রেমই একমাত্র প্রকৃত ধর্ম, অন্য ধর্ম মিথ্যা এবং মন্দির ও মসজিদের অপেক্ষা হৃদয়ই ভগবানের শ্রেষ্ঠ বেদি।" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবীরের একশত দোঁহার ইংরেজী অনুবাদ করেন।

কোনো ব্যক্তি কবীরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন — 'আপনার নাম ও জাতি কী'? উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ—

"হিন্দু কহোঁ তো মৈঁ নহিঁ, মুসলমান ভী নহিঁ।

পাঁচ তত্ত্ব কা পুতলা, গৈবী খেলৈ মাঁহি।।"

শব্দস্বরূপী নাম সাহেব কা, সো নিজ নাম হামারা।

নহিঁ মেরে হাড় চাম নহিঁ, লোহুঁ হম সতনাম উপাসী।।"

অনুবাদ

"আমাকে হিন্দু বলতো আমি হিন্দু নই, কিন্তু আমি মুসলমানও নই। ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোম — এই পঞ্চতত্ত্বের পুতলি আমি। এই পুতলির মধ্যে অসীমের অবিরাম খেলা চলছে। আমার সাহেব বা প্রিয়তমের নাম শব্দস্বরূপ

অর্থাৎ প্রণব (ওঁ) এবং তাহাই আমার নিজের নাম। আমার হাড়, চামড়া ও রক্ত নেই, আমি প্রণবস্বরূপ এবং সত্যনামের উপাসক।"

"সাঁচ বরাবর তপ নহি, ঝুট বরাবর পাপ।
জাকে হৃদয়া সাঁচ হৈ, তাকে হৃদয়া আপ।"

অনুবাদ

'সত্য বলার মতো তপস্যা নেই, মিথ্যা বলার মতো পাপ নেই। যাঁর হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত তাঁর হৃদয়েই সত্যস্বরূপ পরমতত্ত্বের বিকাশ হয়।

করতে পারো

তোমরা কবীরের বাণী জোগার করে বড় কাগজের বোর্ডে সুন্দর করে লিখে ক্লাসে বা স্কুলের বোর্ডে টাঙ্গাতে পারো।

পাশের পড়া

আশা দেবী

পড়ার আগে ভাবো

যে কোন ভাবে পরীক্ষায় পাশ করাই কি তোমাদের লক্ষ্য? ভেবে দেখো, পড়াশোনার সাহায্যে সত্যিকারের বড়ো আর ভালো ছেলে হয়ে ওঠা আরও বেশি জরুরি নয় কি?

পরীক্ষার সময় হলো
কালীঘাটের ফুলটা কই?
হাঁ করে যে আছিস চেয়ে
পরব ফোটা আন না দই।
জল ভরা ঘট কোথায় গেল,
কোথায় গেল আমের ডাল।
কারুর বুঝি নেই খেয়াল!
দেব দেবীদের জনে জনের
ঠেকিয়ে মাথা সবার পায়
ঘাড়টা গেল টনটনিয়ে
ব্যথার চোটে প্রাণটা যায়।
বেরোই তবে? এই সেরেছে
পেছন থেকে ডাকল কে?
নিইনি কলম, ভুল হয়েছে?
যা ছুটে নিয়ে এসে দে।
জয় মা কালী! বেরোই এবার,
হঠাৎ একী শব্দরে!
ধড়ফড়িয়ে উঠল যে বুক,
শরীর হলো স্তব্ধ যে,
সময় বুঝে গলির মোড়ে
হাঁচল কেরে ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচ,
একটি কোপে পাশের গলা
কাটল বুঝি খ্যাঁচোর খ্যাঁচ।
আর হবে কী? শুই গে খাটে
আন রে খেঁদি ঠান্ডা জল
এতই বাধা পড়ছে যখন
পরীক্ষাতে কী আর ফল।

জেনে রাখো

খেয়াল	—	মনে রাখা, অনুমান, কল্পনা।
ধড়ফড়িয়ে	—	অস্থিরতা প্রকাশ করা, ছটফট করা, হৃৎপিন্ডের স্পন্দন তাড়াতাড়ি হওয়া।
টনটনিয়ে	—	ব্যথা করা।
স্তব্ধ	—	থেমে যাওয়া, নিশ্চল।
কুসংস্কার	—	সংস্কার কথাটির অর্থ হলো ধারণা বা বিশ্বাস। যে বিশ্বাস আমাদের সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে না, সেগুলি কুসংস্কার (মন্দ/খারাপ সংস্কার)

কবি পরিচিতি

আশা দেবী (১৯২৫-১৯৮৭) কলকাতার রামমোহন কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা। প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী। শিশু সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখিকা। শিশু সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত বই 'শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' তিনি নারী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। বিশ্ব নারী সংঘের আহ্বানে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ — ঘুমতি নদীর ঢেউ, হাসির গল্প, কুট্টি পিসি অ্যান্ড কোং, লাল তারা নীল তারা' রঙীন বেলুন, রক্তলিপি প্রভৃতি।

কাব্য পরিচয়

কুসংস্কার মানুষের মনকে দুর্বল করে তোলে। যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখলে এসবের কোন মূল্য নেই। পরীক্ষায় পাশ করতে হলে মন দিয়ে পড়াশোনা করা দরকার। কবিতাটিতে আমরা দেখতে পাই, পড়ার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে নানারকম অজুহাত। যার ফলে, পরীক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে না যাওয়াই ঠিক করে। এতে ক্ষতি হলো তারই। নষ্ট হলো একটি বছর। এগিয়ে যাবার বদলে আরও পিছিয়ে পড়লো সে।

পাঠ বোধ

সঠিক উত্তর দাও—

1. পরীক্ষার সময় হোল
   কালীঘাটের ..... কই?
   ক) ফলটা খ) ফুলটা
   গ) পাতাটা ঘ) মালাটা
2. জলভরা ঘট কোথা গেল
   কোথায় গেল.....ডাল।
   ক) জামের খ) বেলের
   গ) আমের ঘ) কুলের
3. জয় মা .....। বেরুই এবার,
   হঠাৎ একী শব্দ রে!
   ক) কালী খ) দুর্গা
   গ) লক্ষ্মী ঘ) সরস্বতী

4. নিইনি ..... ভুল হয়েছে?

যা ছুটে নিয়ে এসে দে।

ক) পেন্সিল　　খ) খাতা

গ) বই　　ঘ) কলম

5. আর হবে কী? শুই গে.....

আন্‌রে খেঁদি ঠান্ডা জল।

ক) ঘরে　　খ) পালঙ্কে

গ) খাটে　　ঘ) বিছানায়

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. পরীক্ষার সময়ে কোথাকার ফুলের জন্য খোঁজ করা হয়?
7. কপালে ফোঁটা পরবার জন্য কিসের প্রয়োজন?
8. বেরোবার সময়ে গলির মোড়ে কিসের শব্দ হলো?
9. কোন দেবতার নাম করে পরীক্ষার্থী বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিল?

সংক্ষেপে লেখো

10. হঠাৎ কিসের জন্য পরীক্ষার্থীর বুক ধড়ফড় করে উঠলো?
11. ব্যথার চোটে তার প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছিল কেন?
12. কী নিতে ভুলে যাবার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল, এবং কোথা থেকে?

বিস্তারিতভাবে লেখো

13. পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে যাবার সময়ে কী কী জিনিসের খোঁজ করেছিল, নিজের ভাষায় লেখো।
14. শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার্থী খাটে শুয়ে পড়বার কথা চিন্তা করেছিল কেন? বিস্তারিত ভাবে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো

ফোঁটা　　দেব দেবী

ঘট　　পরীক্ষা

শরীর　　স্তব্ধ

2. এক কথায় লেখো

ক) যে পরীক্ষা দেয়।　　ঘ) যে উপকারীর উপকার স্বীকার করেনা।

খ) পানের অযোগ্য।　　ঙ) যে গাছ কোন কাজে লাগেনা।

গ) পাখির কলরব।　　চ) যে গাড়ি চালায়।

3. বিপরীত শব্দ লেখো

সময়	পাশ
ঠান্ডা	ভরা
ভুল	পেছন

4. পদ পরিবর্তন করো

জল	ভুল
ব্যথা	খেয়াল
প্রাণ	

5. পরীক্ষা দিতে যাবার সময় তোমার কি ধরনের অনুভূতি হয়? সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

করতে পারো —

বন্ধুদের সঙ্গে নানারকম কুসংস্কার আর তার কুফল সম্পর্কে আলোচনা করে সেগুলি দূর করার চেষ্টা করতে পারো।

আবির্ভাব

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পড়ার আগে ভাবো

আবির্ভাবের, আভিধানিক অর্থ - প্রকাশ, উদয়, অবতরণ। দেবতার আবির্ভাব হয়। যেমন সূর্যের আবির্ভাব। এই পৃথিবীতে মহান ব্যক্তিগণ তাঁদের চারিত্রিক গুণে দেবত্ব লাভ করেন, সেইজন্য তাঁদের জন্মকেও আবির্ভাব বলে উল্লেখ করা হয়।

সূর্যদেব,
আজি এই বৈশাখের খরতপ্ত তেজে
পৃথিবী উন্মত্ত যবে তুমি এলে সেজে
কনক-উদয়াচলে প্রথম আবেগে
ফেলিলে চরণচিহ্ন, তার স্পর্শ লেগে
ধরণী উঠিল কাঁপি গোপন স্পন্দনে
সাজাল আপন দেহ পুষ্প ও চন্দনে
তব পূজা লাগি। পৃথিবীর চক্ষুদান
হল সেই দিন। অন্ধকার অবসান,
যবে দ্বার খুলে প্রভাতের তীরে আসি
বলিলে, হে বিশ্বলোক তোরে ভালবাসি,
তখনি ধরিত্রী তার জয়মাল্যখানি
আশীর্বাদসহ তব শিরে দিল আনি —
সস্মিত নয়নে। তারে তুমি বলেছিলে,
জানি এ যে জয়মাল্য, মোরে কেন দিলে?
কতবার তব কানে পঁচিশে বৈশাখ
সুদূরের তরে শুধু দিয়ে গেল ডাক,
তুমি বলেছিলে চেয়ে সম্মুখের পানে
"হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

জেনে রাখো

খরতপ্ত	—	প্রবল তাপ, তীব্র তাপ
উন্মত্ত	—	পাগল, উত্তেজিত
কনক	—	সোনা
উদয়াচল	—	পূর্বদিকে কল্পিত যে পর্বত থেকে সূর্য উদয় হয়।
কনক উদয়াচল	—	সোনার আভা যুক্ত উদয়াচল।
চরণচিহ্ন	—	পায়ের চিহ্ন
ধরণী	—	পৃথিবী
স্পন্দন	—	কম্পন, কাঁপন
চক্ষুদান	—	দৃষ্টিশক্তি দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, প্রতিমার চোখে জ্যোতি সম্পাদন-পূর্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা ।
অবসান	—	শেষ
দ্বার	—	দরজা
শিরে	—	মাথায়
সস্মিত	—	হাসি-হাসি, ঈষৎ হাস্য
নয়নে	—	চোখে
সুদূর	—	অতিদূর
হেথা	—	এখানে

কবি পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) — মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান হয়। এই অল্প বয়স কালের মধ্যেই তিনি অত্যাশ্চর্য কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর কবিতায় সংগ্রামী দৃঢ় মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধজনিত বিপর্যয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এর প্রভাবে সুকান্তর কবিতা হয়ে ওঠেছিল বাস্তবধর্মী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন। "আমাদের মধ্যে জীবনের আকাঙ্খাকে মুখর করে তোলার তপস্যায় সুকান্ত তাঁর বাল্যয় জীবনকে আহুতি দিয়েছিলেন।" তিনি ছেলেবেলায় কঠোর দারিদ্র্য অভাব অনটনের মধ্যে কাটিয়েছেন। তৎকালীন স্বাধীনতা পত্রিকায় 'কিশোর সভা' অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে, ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, অভিযান, হরতাল প্রমুখ। সুকান্ত অনেক গানও রচনা করেছেন। ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' কাব্যগ্রন্থের সম্পাদনা করেন। যক্ষা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

কাব্য পরিচয়

আবির্ভাব কবিতাটি সূর্যপ্রণাম সংকলনে উদয়াচলের অন্তর্গত। কবি সুকান্ত এই কবিতার মাধ্যমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। কবিগুরুকে সূর্যদেব বলে সম্বোধন করে জানিয়েছেন — বৈশাখের তীব্র তাপে এই পৃথিবী যখন পাগল প্রায়। তাপ শুধু বাইরে নয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে মানবের মনেও, সেখানে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি। ঠিক সেই সময় পূর্বাঞ্চলে সোনার আভা এই ধরনীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে, এ সেই মহান পুরুষের প্রকাশ। ২৫শে বৈশাখে যাঁর আবির্ভাবে এই পৃথিবীও পুষ্প চন্দনে সেজে উঠল, যিনি এ জগতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিলেন, জগতকে ভালবাসতে শেখালেন। জগৎও তাঁকে জয়ের মালায় বরণ করে নিল। কিন্তু কবিগুরু এ জগতের কোন

বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাননি। একদিন তিনি তাঁর 'বলাকা' কাব্যের মধ্যদিয়ে অনন্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

এই কাব্যে কবি সুকান্ত কবিগুরুর উক্তি দিয়েই যেন গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করেছেন।

জেনে রেখো — একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবিগুরু বলা হয়।

পাঠ বোধ

প্রশ্নের নিচে দুটি বিকল্প দেওয়া আছে। ঠিক উত্তরটি লেখো ।

1. 'আবির্ভাব কবিতায় সূর্যদেব কে?

   (ক) পূব আকাশের সূর্য (খ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

2. 'সাজাল আপন দেহ পুষ্প ও চন্দনে', কার দেহ সাজাল?

   (ক) কবির (খ) পৃথিবীর

3. আবির্ভাব কবিতায় চক্ষুদানের অর্থ কী?

   (ক) দৃষ্টিশক্তি দান (খ) অজ্ঞকে জ্ঞান দান

4. পঁচিশে বৈশাখ কোন কবির জন্মদিন?

   (ক) সুকান্ত ভট্টচার্য (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

5. "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।" এই লাইনটি মূলতঃ কোন কাব্যে আছে?

   (ক) বলাকা (খ) আবির্ভাব

সংক্ষেপে উত্তর দাও

6. আবির্ভাব কবিতায় কার আবির্ভাব হয়েছে?
7. উদয়াচল বলতে কী বোঝ?
8. কোন 'অন্ধকার অবসানে'র কথা বলা হয়েছে?
9. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জগৎ কোন জয়ের মালা দিয়েছিল? নাম লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

উদয়াচল	দিন	সম্মুখ
অন্ধকার	প্রভাত	সুদূর

2. নিচের শব্দগুলির আরও দুটি করে সমানার্থক শব্দ লেখো

   যেমন — রাত্রি - রজনী, নিশি

ধরণী	অন্ধকার	নয়ন
কনক	প্রভাত	পুষ্প

একটি নমুনা

অর্থ স্পষ্ট করো

"কনক - উদয়াচলে প্রথম আবেগে
ফেলিলে চরণচিহ্ন, তার স্পর্শ লেগে
ধরনী উঠিল কাঁপি গোপন স্পন্দনে
সাজাল আপন দেহ পুষ্প ও চন্দনে
তব পূজা লাগি। পৃথিবীর চক্ষুদান
হল সেই দিন।"

পূর্বদিকে প্রথম প্রভাতে সূর্য ওঠার আগে তার আভায় সমগ্র পৃথিবী সোনার বরণে সেজে উঠেছে। ধীরে ধীরে প্রভাত সূর্যের আগমনে ফুল ফুটে ওঠে, তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এই পৃথিবীতে, যেন সূর্যদেবের জন্য পূজার আয়োজন। এ সূর্যদেব স্বয়ং কবিগুরু। এই ধরনীতে তাঁর আবির্ভাব যেন সূর্যের কিরণের মতই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর আবির্ভাবে জগতে জমে থাকা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরে সরে গিয়ে জ্ঞানের আলোয় জগৎ আলোকিত হয়ে উঠেছে ।

করতে পারো

বন্ধুরা মিলে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

'আবির্ভাব' কবিতাটি মুখস্থ করে আবৃত্তি করো ।

কাক্কোকিল

প্রণব মুখোপাধ্যায়

পড়ার আগে ভাবো

কাক + কোকিল = কাক্কোকিল। কবি কাব্যের গঠন শৈলী ও মাধুর্যকে রক্ষা করতে কাক ও কোকিল সংবাদের নামকরণ সন্ধি করে উপস্থাপিত করেছেন। তোমরা নিশ্চয়ই কাককে খড়-কুটো নিয়ে বাসা বাঁধতে দেখেছো। কাকের মতো কোকিলকেও কি বাসা বাঁধতে দেখেছো?

কাক—

এই তো ভোরে ডিম পেড়েছি দুই দুগুণে চার
কোত্থেকে ফের জুটল এসে বাড়তি দুটি আর?
হিসাব মতো লাভটি বিনা ক্ষতি তো নেই মোটে
চারের ওপর এমনি যদি বাড়তি দুটি জোটে।
জুটল এসে কোন যাদুতে? নাই বা হল জানা -
চারের ওপর বাড়তি দুটি মিলবে আমার ছানা।

কোকিল —

কাকের বাসায় কেমন বেড়ে
ডিম ক'খানা এলাম পেড়ে
বেশী তো নয়, দুটি
চারটি ডিমের সঙ্গে ক্রমে
আমার বিনা পরিশ্রমে
উঠবে তারা ফুটি।
কাকের ছানার সঙ্গে জুটে
খাবার খাবে দিব্যি খুঁটে
হলেই বড়োসড়ো
বাচ্চা দুটি উড়িয়ে নিয়ে
কাকের মাকে বক দেখিয়ে
দিব্যি কেটে পড়ো!

কাক —

তা দিয়ে বেশ ফুটিয়েছি তো আমার ছানাগুলো,
খাবার তরে চেচিয়ে মরে, আচ্ছা বটে নুলো!
বাড়তি ডিমের ছানা দুটোর চেল্লানীটা বেশি
সবার আগেই খাবারটুকু ফেলছে করে শেষই!
যেই হয়েছি চোখের আড়াল করতে খাবার চুরি

কোকিল কেন বাসার ধারে করছে ঘোরাঘুরি ?

কোকিল —

আর দেরি নয় আয় না চলে
মায়ের ছানা মায়ের কোলে
কেউ পাবে না টের,
ছোট্ট ডানা ঝট্‌পটিয়ে
নিমডালেতে বোস না গিয়ে
বয়স হল ঢের !

কাক —

কান্ড একি, ছানা দেখি রইল মোটে চার
বাড়তি ডিমের বাচ্চাদুটো কোথায় পগারপার ?

কোকিল —

দোহাই বাপু, যেও না চটে
কাকের ডিমে কোকিল ফোটে
আচ্ছা বটে গেরো,
বাচ্চা নিয়ে পড়ছি সরে
এবার থেকে হিসেব করে
ডিম ক'খানা পেড়ো।

কাক —

ডিম ফুটিয়ে বেজায় ঠকান্ ঠকেই গেলাম ছি-ছি
কোকিল ছানার পিছেই খেটে মলাম মিছামিছি।
পক্ষীকুলে বংশ বায়স আমরা চালাক বটে,
জানত কেবা কোকিল এমন বুদ্ধি ধরে ঘটে ?

জেনে রাখো

বেড়ে	—	চমৎকার, বেশ (শব্দটি কিন্তু হিন্দী শব্দ বড়িয়া থেকে এসেছে)
বক দেখিয়ে	—	বকের গলা ও মুখের মতো হাত বাঁকিয়ে অভদ্র বিদ্রূপ করা।
তা দেওয়া	—	ডিম ফুটানোর জন্য পাখির মায়ের ডিমের উপর তাপ দেওয়া।
নুলো	—	বিড়ালের থাবা, এই কবিতায় নুলো অর্থ লোভী।
চেল্লানী	—	চিৎকার করা, চেঁচামেচি করা (কথ্যরূপ)
পগারপার	—	পালিয়ে সীমা বা নাগালের বাইরে যাওয়া।
গেরো	—	বিপদ (গিঁঠ বা বাঁধনও হয়)
বায়স	—	কাক
বুদ্ধি ধরে ঘটে	—	এখানে ঘট অর্থ মাথা। বুদ্ধি ধরে মাথায়।

কবি পরিচিতি

প্রণব মুখোপাধ্যায় (১৯৩৭—) মূলত কবি। ছোটদের জন্য অসংখ্য কবিতা ও ছড়া লিখেছেন। তাঁর লেখাগুলি ছন্দের নিপুণ প্রয়োগে সমুজ্জ্বল। বিষয় বৈচিত্রের জন্য তাঁর কবিতা প্রশংসার যোগ্য। ছোটদের জন্য লেখা কবিতাগুলি সহজ, সরল ও সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। সর্বোপরি চিত্তাকর্ষক। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই — অতলান্ত, বুদ্ধির্মস্য ইত্যাদি।

কাব্য পরিচয়

কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে, কারণ কোকিল কখনও বাসা বাঁধে না। কবি কাব্যের মধ্যদিয়ে এই ঘটনাটির সরস, সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন।

চারটি ডিমের জায়গায় দুটি অধিক ডিম দেখে কাকের সামান্য চিন্তা হয়। তবুও ছয়টি ডিম নিজের ভেবে তা দেয়, এবার ছানাগুলিকে সমান যত্নে বড় করে তোলে। কোকিলও ভাবছে কাককে কেমন বোকা বানানো হয়েছে। তার বিনা পরিশ্রমে ডিম ফুটে বাচ্চা হবে, সেগুলিকে কাক নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে বড় করে তুলবে। এইভাবে কাককে বোকা বানানোর আনন্দ কোকিলের মনে। কাকও তার বাসার কাছে, কোকিলের ঘোরাঘুরিতে সন্দেহ প্রকাশ করে। কিন্তু বাচ্চা একটু বড় হতেই মা কোকিল তাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়।

কাক নিজের বোকামিতে নিজেই দুঃখ প্রকাশ করে। কাক জানে, পক্ষীকুলে তাদেরই সবথেকে বুদ্ধিমান মনে করা হয়, কিন্তু কোকিলের বুদ্ধির কাছে সে হেরে যায়।

পাঠ বোধ

1. কাক ও কোকিল এই দুটি পাখির মধ্যে কোন্ কোন্ মিল তোমরা খুঁজে পেয়েছো? একটি উদাহরণ দেওয়া হোল অন্য দুটি লেখো।

   ক) দুটি নামের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম বর্ণ 'ক' দুবার পাওয়া যায়।

   কাক কোকিল

   খ)

   গ)

সংক্ষেপে উত্তর দাও

2. 'কোত্থেকে ফের জুটল এসে বাড়তি দুটি আর'? বাড়টি দুটি কি জুটেছে?

3. 'আমার বিনা পরিশ্রমে / উঠবে তারা ফুটি'।
   আমি কে? পরিশ্রমটা কী? কারা ফুটে উঠবে?
4. 'বক দেখানো' বলতে কী বোঝায়? লেখো
5. পগারপার বলতে কী বোঝ?
6. বায়স শব্দটির অর্থ কি?

বিস্তারিতভাবে লেখো

7. 'কাক্কোকিল' শব্দটি কোন ধরনের শব্দ? কবি কেন এমন শব্দ প্রয়োগ করেছেন?
8. 'আর দেরি নয় আয় না চলে
   মায়ের ছানা মায়ের কোলে
   কেউ পাবে না টের"
   উপরের কথাগুলি কে বলেছে? কাদের এবং কেন বলেছে? কবিতা ও কবির নাম উল্লেখ করে বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের জোড়া শব্দগুলির একই বানান, একই উচ্চারণ কিন্তু বাক্য প্রয়োগে ভিন্ন অর্থ হয়। তুমি শব্দগুলি বাক্যে প্রয়োগ করে অর্থ পার্থক্য বোঝাও।

ছানা	তারা	দিব্যি	কেটে	পড়া
ছানা	তারা	দিব্যি	কেটে	পড়া

2. নিচের কথাগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো —
   ক) বক দেখানো খ) ঘটে বুদ্ধি আছে
   গ) কেটে পড়া ঘ) আচ্ছা গেরো হোল
   ঙ) পগারপার

মানুষের গল্প

আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়

পড়ার আগে ভাবো

কোন অভাব বা ক্রোধ কিংবা খারাপ স্বভাব আমাদের মনকে মানুষ থেকে হৃদয়হীন পশুতে পরিণত করে। হয়ত হঠাৎ কোন ঘটনা এই পশুভাবাপন্ন মনটাকে হৃদয়বান মানুষে উত্তীর্ণ করে। ক্লাসে ক্রোধের বশে তোমরাও কি কখনও বন্ধুর সঙ্গে মানুষের মতো নয় পশুর মতো ব্যবহার করো? ভেবে দেখো তো।

বরফের মত জমা আঁধার
জ্বলছে না কোন বাতি,
চোরটা ঢুকল চুপি চুপি ঘরে
লোডশেডিং-এর রাতি।।
বাড়িতে যে আর কোন লোক নেই
একা আছে নিশিকান্ত
এ খবর তার সংগ্রহে ছিল
অর্থাৎ সে তা জানত।।
পা টিপে টিপে এগিয়ে বিঘৎ
সিন্দুকটা সে খুলল
ঝোলা ভরে নিল সোনাদানা কিছু
হয়ে খুব উৎফুল্ল।।
কিন্তু ওদিকে কিসের শব্দ,
হঠাৎ সে উদভ্রান্ত
কার যেন শুনি মরণ গোঙানি
শুনছেনা ভুল কান তো!!
কানটা বাড়িয়ে কিছুখন থেকে
নিশ্চিত হল শেষটায়
মুমূর্ষু নিশি কাছে ডাকে তাকে
বাঁচার করুণ চেষ্টায়।।
ডাক-শুনে তার থমকে দাঁড়িয়ে
চোর ভাবে কী যে করব?
সোনাদানা ভরা ঝোলাটাকে নিয়ে

বাড়ির পথ কী ধরব ?
কিন্তু সে পথ আটকে দাঁড়াল
চোরের মানুষ সত্তা
চোর নয়, আজ সামনে যে খোলা
মানুষ হওয়ার পথ তার।।
ব্যস্ তারপর ঝোলাটা চুরির
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাতালে
নিশিকান্তকে কোলে তুলে নিয়ে
চলল সে হাসপাতালে।।

জেনে রাখো

বরফের মত জমাট আঁধার	—	গভীর অন্ধকারকে জমাট বাঁধা শক্ত বরফের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্ধকারে এতটুকু আলোর রেখা নেই।
বিঘৎ	—	হাতের চেটো প্রসারিত করলে বুড়ো আংগুলের মাথা থেকে কড়ে আংগুলের মাথা পর্যন্ত মাপ, আধ হাত মাপ।
সিন্দুক	—	মজবুত ও বড় বাক্স।
উদভ্রান্ত	—	ব্যাকুল
কিছুখন	—	কিছুক্ষণ (কবিতায় ছন্দের প্রয়োজনে কিছুখন হয়েছে)
মুমূর্ষু	—	মরণাপন্ন
নিশি	—	রাত্রি (কবিতায় নিশি ব্যক্তির নাম)
নিশিকান্ত	—	চাঁদের আর একটি নাম (এই কবিতায় বৃদ্ধের নাম)
সত্তা	—	অস্তিত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, সাধুতা
চোরের মানুষ সত্তা	—	চোরের হৃদয়ের মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব
চাতালে	—	উঠানে।

কাব্য পরিচয়

এক গভীর আঁধার রাতে একটি চোর নিশিকান্ত নামে কোনো এক ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করে। চোর চুরি করতে আসার আগে মোটামুটি জেনেছিল বৃদ্ধ নিশিকান্ত একা আছে, তাই সে নিশ্চিন্তে নিঃশব্দে সিন্দুক খুলে সোনাদানা যা কিছু ছিল ঝোলা ভরে নিলো। হঠাৎ মরণাপন্ন ব্যক্তির গোঙানি চোরের কানে এলো। বৃদ্ধ নিশিকান্তের বাঁচার করুণ আবেদন হৃদয়হীন চোরের হৃদয়ে আঘাত হানল। তার মনে দ্বিধা — সে সোনা-দানা ভরা ঝোলা নিয়ে বাড়ির পথে যাবে। না কি বৃদ্ধকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে? অবশেষে হৃদয়হীন পশু মনটার পরাজয় হোল, চোর হৃদয়বান মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হোল। অর্থ অলঙ্কার সব ফেলে বৃদ্ধকে কোলে তুলে নিয়ে হাসপাতালের পথে পা বাড়ালো।

লক্ষ্য করো —

একটি ছোট ঘটনা যা ছোট্ট গল্পের রূপ নিতে পারে তা কবির হাতে পড়ে কিভাবে কাব্যে রূপান্তরিত হোল।

পাঠ বোধ

সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. আঁধারকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
2. চোর কখন ঘরে ঢুকল?
3. কোন খবরটি চোরের সংগ্রহে ছিল?
4. কবিতায় নিশিকান্ত কার নাম?
5. নিশিকান্ত শব্দটির অর্থ কী?
6. চোর কেন খুব খুশি হোল?
7. চোর হঠাৎ ব্যাকুল হোল কেন?
8. কানটা বাড়িয়ে চোর কী শুনে নিশ্চিত হোল?

9. বৃদ্ধের ডাক শুনে চোর প্রথমে কী ভাবল?

10. বৃদ্ধের করুণ আবেদনের পরে চোর কী করল?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

11. কবিতাটির নাম 'মানুষের গল্প' কেন হোল? বুঝিয়ে লেখো।

12. কবিতা ও কবির নাম লিখে নিচের লাইনগুলির মানে বুঝিয়ে লেখো।

"....কিন্তু সে পথ আটকে দাঁড়াল
চোরের মানুষ সত্তা
চোর নয়, আজ সামনে যে খোলা
মানুষ হওয়ার পথ-তার।।"

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

আঁধার	মরণ	নিশ্চিত
চোর	ভুল	বাঁচা

2. বাক্য তৈরি করো

উৎফুল্ল	মুমূর্ষু	উদ্‌ভ্রান্ত
সংগ্রহ	করুণ	সিন্দুক

স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায়

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

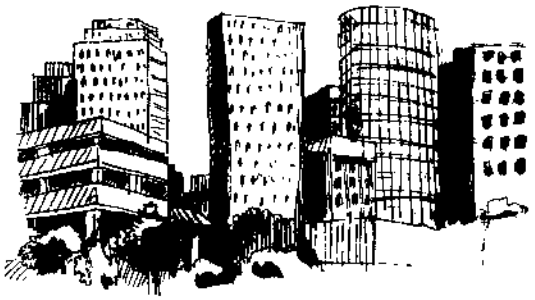

পড়ার আগে ভাবো

নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, ছোট পুকুর, পশু-পাখিদের নির্ভয় আশ্রয় এ সবকিছু স্বপ্নের মতো ইট পাথরের বিশাল বিশাল বাড়ির মাঝে হারিয়ে যেতে থাকে। তোমাদের চারপাশের সুন্দর এই স্বপ্নের মতো প্রকৃতি ছোট ছোট পশু-পাখি হারিয়ে যাচ্ছে এই বেদনাকি তোমরা অনুভব করতে পারছো ?

এইখানেতে মাঠ ছিল এক, পুকুর ছিল তার পাশে
ধুনতো তুলো মাধাই বুড়ো, শিমুল কিংবা কাপাসে।
এইখানেতে বট্ ছিল এক, সিঁদুর মাখা ঘট ছিল
আকাশছোঁয়া উঠবে বাড়ি, এমনি কথাই রটছিল।
চুপ করে মাঠ শুনছিল সব, শেষের সেদিন গুণছিল
শীতের রোদে খুনসুটিতে জাফরি ঘাসে বুনছিল ।

তারপরেতে আর মনে নেই, হলাম কবে ঘরছাড়া
আকাশটাকে ভুলেই ছিলাম, কোথায় ছিল সাঁঝতারা।
কিশোরবেলার মাঠের স্মৃতি হারিয়ে গেল কোনখানে
শহর আমায় কংক্রিটে তার হাজির করে একটানে।
সেইখানেতে সময় কাটে, তেপান্তরের স্বপ্নহীন
পেরিয়ে এলাম অনেক বছর, ইটপাথরের রাত্রিদিন।

এইখানেতে মাঠ ছিল এক, পুকুর ছিল তার পাশে
বৃষ্টিভেজা ফুল্ল কদম মাতিয়ে দিত তার বাসে।
সেইতো কবে পুকুর পাড়ে হাঁসগুলো সব ডাকছিল
রোদের গুঁড়ো কাঠবিড়ালী নিজের গায়ে মাখছিল।
হারিয়ে গেল কোথায় সে মাঠ, পদ্মপুকুর আজ কোথায়
তুলছে মাথা বিশাল বাড়ি, স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায় ।

জেনে রাখো

শিমূল	—	তুলো, এই তুলোর বিশাল গাছে লাল লাল ফুল হয়।
কার্পাস	—	তুলো, গাছগুলি ছোট হয়, সাদা রংএর ছোট ছোট ফুল হয়।
শেষের সেদিন গুনছিল	—	মৃত্যুর দিন গুনছিল।
ফুল্ল	—	প্রস্ফুটিত, পুরোপুরি ফুটে ওঠা।
জাফরি	—	ছোট ছোট চৌকো খোপের জাল।
তেপান্তর	—	মানুষজনহীন বিশাল মাঠ।
বাস	—	সুগন্ধ (বাস-এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। বাস-বস্ত্র, কাপড়; বাস-আবাস, বাসস্থান।)

'শীতের রোদে খুনসুটিতে জাফরি ঘাসে বুনছিল — শীতকালে মাঠে ঘাসের উপরে ছোট্ট ছোট্ট মাকড়সারা জাফরির মতো জাল বুনছিল। তোমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে জালের উপর ভোরের শিশির বিন্দু ছড়িয়ে থাকে, তার উপর রোদ পড়ে জালের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে।

'রোদের গুঁড়ো কাঠবিড়ালী নিজের গায়ে মাখছিল — কাঠবিড়ালী ঘাসের উপর শীতের হাল্কা রোদটুকু যেন গায়ে মেখে খেলায় মেতেছিল।

কাব্য পরিচয়

কবির শৈশব ও কিশোরবেলার সেই পুকুর, খোলা মাঠে যেখানে কোনো এক শীতের দিনে লেপ-তোশকের জন্য তুলো ধোনা হোত। যেখানে ছিল এক প্রাচীন বটগাছ যার নিচে পাতা ছিল সিঁদুর মাখানো ঘট। একদিন এই সবুজ মাঠ, পুকুর, তারা ভরা আকাশ এসব কিছু যেন ইট পাথরের তলায় চাপা পড়ে গেল। এই প্রকৃতির কোল থেকে কবিকেও গৃহহারা হতে হয়, তাই কবির স্মৃতির মাঝে বার বার ফিরে আসে সেই স্বপ্নের দিনগুলি। সেই হারিয়ে যাওয়া মাঠ, পদ্ম পুকুর যেখানে হাঁসেদের ভেসে বেড়ানো, কদম ফুলের গন্ধ ছড়ানো, শীতের রোদে কাঠবিড়ালীর খুশিতে মন মাতানো। এসব কিছুকে ধ্বংস করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শুধু বিশাল বাড়ির সারি। কবির মনে প্রকৃতিকে হারাবার বেদনা যেন কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

পাঠ বোধ

পাশের শব্দগুলি ঠিক জায়গায় বসাও

1. এইখানেতে ..... ছিল এক, ... ছিল তার পাশে। (পুকুর / মাঠ)
2. এইখানেতে ..... ছিল এক, সিঁদুর মাখা..... ছিল। (বট / ঘট)
3. ..... ভুলেই ছিলাম, কোথায় ছিল..... । (সাঁঝতারা / আকাশটাকে)
4. সেই তো কবে ..... সব ডাকছিল। (হাঁসগুলো / পুকুর পাড়ে)

সংক্ষেপে লেখো

5. কে তুলো ধুনতো?
6. কত রকমের তুলো ছিল? সেগুলির নাম লেখো।
7. কবি আকাশটকে কেন ভুলে ছিলেন?
8. 'রোদের গুঁড়ো কাঠবিড়ালী নিজের গায়ে মাখছিল' এর মানে কি? লেখো।

বিস্তারিতভাবে লেখো

9. মাঠের চারপাশে কী কী ছিল ? কেন মাঠ 'শেষের সেদিন গুণছিল'? 'স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায়' কবিতাটি অবলম্বনে বুঝিয়ে লেখো।

10. হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের দিনগুলি কবির স্মৃতিতে বার বার ফিরে আসে।

'স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায়' কবিতাটি অবলম্বনে কবির সেই স্বপ্নের দিনগুলির বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

11. ব্যাসবাক্য সহ কোনটি কোন সমাস লেখো

ইট পাথর	তেপান্তর
রাত্রিদিন	সাঁঝতারা

12. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো

আকাশছোঁয়া	কিশোরবেলা	পুকুরপাড়ে
ঘরছাড়া	বৃষ্টিভেজা	পদ্মপুকুর

আলোচনা করো

গ্রামগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়ে সেখানে কংক্রিটের বিশাল বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে। ছোট ছোট দোকানপাট শেষ করে বড় বড় এয়ারকন্ডিশন বাজার (শপিংমল) তৈরি হচ্ছে। তুমি কি এগুলো সমর্থন করো? এ বিষয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে ক্লাসে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

করতে পারো

1. গাছকাটা, পুকুর বুজিয়ে ফেলা দন্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের কোন অন্যায় করতে দেখলে বাড়ির বড়দের বা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জানাও।

2. তোমরা স্কুলের বন্ধুরা মিলে ছুটির দিনে জায়গা নির্বাচন করে গাছ লাগাও। এ বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকের সাহায্য নাও। গাছগুলি দেখা শুনার ভার নিজেদের হাতে তুলে নাও। ফিরিয়ে আনো হারিয়ে যাওয়া পাখিদের।

“অজানাকে জানো
অচেনাকে চেনো”

অ্যান্টার্কটিক অভিযান

সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

প্রখ্যাত ভূততাত্ত্বিক, প্রথম বাঙালী তথা ভারতীয় মহিলা যিনি সম্প্রতি পৃথিবীর তলদেশে হিমময়ী দুর্জয় কুমেরুতে ভারতীয় অভিযানে অংশ নিয়েছেন। পর্বতাভিযানেও খ্যাতকীর্তি - হিমালয়ের 'রটি' প্রভৃতি অভিযানে সফল যাত্রী। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'ললনা' অভিযানের সহনেত্রী - হিমালয়ের এক অজেয়, অনামী শৃঙ্গ (২০,১৩০ ফিট) জয়ের গৌরব অর্জনকারিণী। লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে রয়েল কমিশনের প্রাক্তন ফেলো। সুইডেনের উপাসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা। স্কটিশ হাইল্যান্ড, স্পেন, সুইডেন ও নরওয়ের আর্কটিকা অঞ্চলে ভূতত্ত্বের গবেষিকা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বিজ্ঞানী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব-বিভাগে অধ্যাপিকা। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুশিল্পে - সুকুশলা-বিশিষ্ট লেখিকা-সম্পাদক ।

পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ কোণায় যে এক বিশাল মহাদেশ লুকিয়ে আছে সেকথা গ্রীকেরা কল্পনা করেছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগেই। এই মহাদেশের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা অ্যান্টার্কটিকোস-যার অর্থ হলো সপ্তর্ষিমন্ডলের বিপরীতে। দক্ষিণের এই মহাদেশে থেকে উত্তর আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ সপ্তর্ষিমন্ডল দেখা যাবে না বলেই এই নামকরণ। তারপর বহু শতাব্দী কেটে গেছে এই মহাদেশকে জানতে। দুঃসাহসী নাবিক ক্যাপটেন জেমস কুক ১৭৭২ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাদেশ আবিষ্কারের আশায় বরফ-জমা দক্ষিণ সমুদ্রে অভিযান চালিয়েছেন। কিন্তু প্যাক আইসের দুস্তর বাধা ভেদ করে অ্যান্টার্কটিকাতে পৌঁছতে পারেননি। তবে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ পরিক্রমা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, যদি কোন মহাদেশ থেকেও থাকে দক্ষিণ মেরুতে তার সঙ্গে উত্তরের ভূখন্ডের কোন যোগ নেই। তিনিই প্রথম কুমেরু বৃত্ত অতিক্রম করেছিলেন।

জেমস কুক দক্ষিণ সমুদ্রে তিমি আর সীলের প্রাচুর্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন; ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে দলে দলে তিমি-শিকারীর দল পাড়ি জমাল দক্ষিণ সমুদ্রে। এমনই এক তিমি-শিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাথানিয়েল পামার ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে দাবি জানান যে, তিনি মূল মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন। একই খ্রীস্টাব্দে রুশ অভিযাত্রী ভন বেলিংসহাওসেন ও ব্রিটিশ অভিযাত্রী জন ব্র্যান্সফিল্ড একই দাবি জানান। আজ সঠিক জানা মুশকিল তাঁরা সত্যিই মূল ভূখন্ড দেখেছিলেন, অথবা বরফে ঢাকা কোন দ্বীপের অংশকেই মূল মহাদেশ ভেবে ভুল করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হলো একের পর এক অভিযান। এই সময় বেশ কয়েকটি অভিযান হয় অ্যান্টির্কটিকাতে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলি পরিচালিত হয় এই দুর্গম মহাদেশে। ধীরে ধীরে এই মহাদেশের নানান অংশ আবিষ্কৃত হলো - বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সঙ্কলিত হলো। পালতোলা জাহাজে চেপে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা যে-মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছেন, নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেও, তার মূল্য আজও অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের ইতিহাসে অনন্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই অংশকে তাই বলা হয় অ্যান্টর্কটিকা অভিযান 'হিরোয়িক পিরিয়ড'। স্কটের ডিসকভারি ও টেরানোভা অভিযান, আমুন্ডসেনের ফ্রামহাইম অভিযান, শ্যাকলটনের নিমরোড ও অরোরা অভিযান এইসময়েই হয়েছে। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর আমুন্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে ওড়ালেন নর ওয়ের জয়পতাকা। স্কট একমাস পরে পৌঁছলেন সেখানে তাঁর চারজন সঙ্গী নিয়ে। আমুন্ডসেন সুস্থদেহে সদলবলে ফিরে এসেছেন কিন্তু স্কট ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রতিকূল প্রকৃতির কাছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের রূপও পালটাতে লাগল। এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, আইসব্রেকার জাহাজ, স্নোট্রাক্টর আর নানান রকম আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হতে লাগল প্রতিকূল প্রকৃতিকে জয় করার জন্য । একটি দুটি উৎসাহী ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারি ব্যবস্থাপনা অভিযান পরিচালনা হতে শুরু হলো। ১৯৫৭-৫৮

খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরে অ্যান্টার্কটিকাতে বিশদ সমীক্ষা করার কর্মসূচী নিয়ে বারোটি দেশ সেখানে স্থায়ী গবেষণাগার স্থাপন করল। এই সম্মিলিত গবেষণার ফল এত ভাল পাওয়া গেল যে, অ্যান্টার্কটিকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তির বলে অ্যান্টার্কটিকার প্রাণী ও পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু করা সেখানে বারণ। আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রিটেন, নরওয়ে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল মূল স্বাক্ষরকারী। ক্রমে ক্রমে এই চুক্তিতে যোগ দিয়েছে পোল্যান্ড, স্পেন, পূর্ব জার্মানি, ব্রেজিল, ভারত ও চীন।

ভারতবর্ষ অ্যান্টার্কটিকা গবেষণায় যোগ দেয় ১৯৮১-৮২ খ্রীস্টাব্দে। ডক্টর সৈয়দ জহুর কাশিমের পরিচালনায় প্রথম অভিযান হয়। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে প্রোথিত হলো ভারতীয় পতাকা। ১৯৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় অভিযান হয় ডক্টর হর্ষ গুপ্তার নেতৃত্বে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ছাড়াও এই অভিযানের প্রধান দায়িত্ব ছিল একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের। আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সক্রিয় উৎসাহে দুজন মহিলা বিজ্ঞানীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হলো তৃতীয় অভিযাত্রী দলে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোগ্রাফির মেরিন বায়োলজিস্ট ডক্টর অদিতি পন্থ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ভূতত্ত্ববিদ হিসাবে নির্বাচিত হলাম।

তৃতীয় অভিযান শুরু হলো ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর গোয়ার মার্মাগাও বন্দর থেকে। দলে ছিল একাশিজন সদস্য। আর্মির কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্স-এর আর্টক্রিশজন; তাঁর দায়িত্ব স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্রটি বানানোর। নেভি ও এয়ারফোর্স থেকে এসেছে তেরজন করে সদস্য। তাদের দায়িত্ব কুমেরু অঞ্চলে হেলিকপ্টারের সাহায্যে অভিযাত্রী ও অভিযানের মালপত্র পৌঁছে দেওয়া। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য ছিলেন ষোলজন ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলার জন্য একজন ক্যামেরাম্যান। ফিনল্যান্ড থেকে আইসব্রেকার জাহাজ ফিনপোলারিস ভাড়া করা হলো। ভারতীয় সদস্য ছাড়া জাহাজের অফিসার ও কর্মী ছিলেন আঠাশজন। ১০ ডিসেম্বর মরিশাস পৌঁছই। সেখানে চারদিন থাকা হয় কিছু খাদ্যসামগ্রী, খাবার জল ও কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার জন্য। ১৪ ডিসেম্বর শুরু হয় আবার সমুদ্রযাত্রা। এবারে অ্যান্টার্কটিকাতেই পৌঁছে হলো যাত্রা শেষ।

গর্জনশীল চল্লিশাতে খুব একটা ঝড়-জলের সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হলো প্রবল ঝড়। পঞ্চাশ ও ষাট ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর বিশেষ কোন ভূখন্ডের বাধা না থাকাতে এই অংশের সমুদ্র সদাই উত্তাল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। আমাদের জাহাজখানা পাঁচদিন ধরে সেই উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করল প্যাক আইসের সীমানায়। তখন সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। যেদিকে দু-চোখ যায় কেবল ভাঙা বরফের রাশি। অ্যান্টার্টিকাকে ঘিরে রয়েছে এই দক্ষিণ সমুদ্র-ভারত, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ। বছরের বেশিরভাগ সময়ই এই দক্ষিণ সমুদ্রের উপরিভাগ জমে বরফ হয়ে থাকে। এই সামুদ্রিক বরফ সাধারণত তিন-চার মিটার পুরু হয়। গ্রীষ্মকালে এর কিছুটা অংশ ভেঙে সমুদ্রের স্রোতের টানে উত্তরে চলে আসে। পরের শীতে আবার এই ভাঙা টুকরোগুলি নতুন করে জমে যায়। অ্যান্টার্কটিকাকে ঘিরে এই জমে যাওয়া ভাঙা সামুদ্রিক বরফের এক বলয় তৈরি হয়। এই অঞ্চলকেই বলা হয় প্যাক আইস। কুমেরু অঞ্চলে প্রবেশের প্রধান বাধাই হলো এই প্যাক আইসের বেড়াজাল।

২৬ ডিসেম্বর আমরা এই বেড়াজাল ভেদ করে পরিষ্কার নীল জলে এসে পড়লাম। অদূরে অক্ষত সামুদ্রিক বরফ-ফাস্ট আইস। ২৭ ডিসম্বের আমাদের জাহাজ সেই ফাস্ট আইসে গিয়েই নোঙর করল। সেখানকার তিন মিটার পুরু বরফ কাটার ক্ষমতা আমাদের ফিনপোলারিসের ছিল না। সেখান থেকে মূল হিমসোপান তিন কিলোমিটার দূরে। পৌঁছনোমাত্র ছুটে এল পেঙ্গুইনের দল। অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া অন্য কোথাও এই পেঙ্গুইনদের দেখা যায় না। কুমেরু অঞ্চলের পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে প্রধান হলো অ্যাডেলি ও এম্পেরর পেঙ্গুইন। এম্পেরর পেঙ্গুইন আকারে বড়, লম্বায় প্রায় সাড়ে চার ফুট। অ্যাডেলিরা লম্বায় আড়াই ফুট মতন হয়। এদের প্রধান খাদ্য হলো দক্ষিণ সমুদ্রের চিংড়ি মাছ-ক্রিল। অ্যান্টার্কটিকার অন্যান্য প্রাণী - যেমন সীল এবং তিমিদেরও প্রধান খাদ্য এই ক্রিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ক্রিলই হয়তো ভবিষ্যতে

পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সমাধান করবে। পেঙ্গুইন ছাড়া অ্যান্টার্কটিকাতে আরো দু-তিন ধরনের পাখি দেখা যায়। শিকারী পাখি স্কুয়া, যাকে বলা হয় অ্যান্টার্কটিকার বাজ, এদের মধ্যে প্রধান । পেঙ্গুইনের ডিম বা শিশু এবং ছোট পাখি পেট্রেলই এই শিকারী স্কুয়ার প্রধান খাদ্য। তবে আজকাল রিসার্চ স্টেশনের ধারেও এরা উড়ে বেড়ায় খাবারের লোভে।

অ্যান্টার্কটিকায় পৌঁছনোর দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল কর্মব্যস্ততা। মূল শিবির ও স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করে ফেলা হলো প্রথম দিনেই। ২৮ ডিসেম্বর আঠাশজন ইঞ্জিনিয়ার ও জওয়ানদের একটি দল চলে গেল মূল শিবির স্থাপন করতে। স্নো ট্যাক্টরগুলিকে সামুদ্রিক বরফের ওপর দিয়েই চালিয়ে নিয়ে মূল বরফভূমিতে রেখে আসা হলো। জওয়ানদের একটা দল ও বিজ্ঞানীদের ওপর ভার দেওয়া হলো অভিযানের মালপত্র ও বাড়ি তৈরি করার সরঞ্জাম হেলিকপ্টার বোঝাই করার। আশা ছিল সাতদিনের মধ্যেই এই মাল খালাসের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর বিজ্ঞানীরা নিজের নিজের সমীক্ষা শুরু করতে পারবেন। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা।

সমস্ত মালপত্র পাঠানো হচ্ছিল হেলিকপ্টারের তলায় নেটে ঝুলিয়ে। বড় হেলিকপ্টার প্রতাপ এভাবে আড়াই টন মাল বহন করতে পারে। এভাবে মাল পাঠানোর ফলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হতে লাগল। আমরা একবারের মাল পাঠিয়ে হেলিকপ্টার ফিরে আসার আগেই দ্বিতীয় দফার মাল তৈরি করে রাখতাম। মূল শিবিরে গিয়ে হেলিকপ্টার নেট নামিয়েই ফিরে আসত। পরেরবার আবার মাল নামিয়ে আগের বারের নেট ফেরত নিয়ে আসত। ততক্ষণে মূল শিবিরে ওরাও মাল নামিয়ে নেটে খালি করে রেখেছে। উনত্রিশ তারিখও এভাবেই মাল নিয়েছিল প্রতাপ হেলিকপ্টার প্রথম দফায় মাল পৌঁছনোর পর আবার দ্বিতীয় দফায় মাল নিয়ে উড়বার সময় জাহাজের ক্রেনের দড়িতে হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেড গিয়ে ধাক্কা খেল। মুহূর্তের মধ্যে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল হিমশীতল জলে। আমরা নিরুপায় দর্শকের মতো জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছি চেতক হেলিকপ্টার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে দড়িতে ঝুলে উদ্ধার করল একজনকে। বাকিদের রেসকিউ বোট নিয়ে উদ্ধার করা হলো। হেলিকপ্টার ততক্ষণে তলিয়ে গেছে গভীর সমুদ্রে। এত ঠান্ডাজলে মানুষের পক্ষে আধঘন্টার বেশিসময় বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের সৌভাগ্য পাঁচজনকেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একজনের চোট কিছুটা গুরুতর ছিল, তার সুস্থ হতে সপ্তাহ তিনেক লেগেছিল। বাকিরা কয়েকদিন বাদেই আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

চোদ্দ মিলিয়ন পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের শতকরা আটানব্বই ভাগই দু-দিন কিলোমিটার পুরু হিমবাহে ঢাকা। হিমবাহের গভীরতা কোন কোন জায়গায় সাড়ে চার কিলোমিটারেরও বেশি। এই মহাদেশীয় হিমবাহে সঞ্চিত আছে পৃথিবীর আটাত্তর শতাংশ মিষ্টি জলের ভান্ডার। বর্তমানে অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া কেবলমাত্র গ্রীনল্যান্ডেই মহাদেশীয় হিমবাহ আছে। তাবে তা আয়তনে অ্যার্টিকটিকা তুষারক্ষেত্রের দশভাগের একভাগ। এই ২৯,০০,০০০ ঘন কিলোমিটার বরফের চাপে অ্যান্টার্কটিকার ভূপৃষ্ঠ ৬০০ মিটার নিচে নেমে গেছে। যদি কোনদিন এই বরফ গলে যায় তবে সারা পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ ৬০ মিটার বেড়ে যাবে, অর্থাৎ সমস্ত বন্দর প্লাবিত হয়ে যাবে।

১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি আমরা পাঁচজন বিজ্ঞানী শির্মাকার পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মূল শিবির স্থাপিত হয়েছে তীর থেকে ১৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে। আরো ৭০ কিলোমিটার ভিতরে এই শির্মাকার ওয়েসিস মাউন্টেন রেঞ্জ অবস্থিত। ভারতীয়রা নাম দিয়েছেন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী পর্বতমালা। চারিপাশের বরফের মধ্যে যখন ছোট একটি পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে বলা হয় ওয়েসিস মাউন্টেন রেঞ্জ। এখানে যদি পাহাড়ের উচ্চতা হিমবাহের গভীরতা থেকে বেশি হয় তবেই তা বরফ ভেদ করে দৃশ্যমান হয়, ঠিক যেমন জলের মধ্যে মাথা তুলে থাকে দ্বীপ। শির্মাকার পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাজ। তিনজন ভূতত্ত্ববিদ ডক্টর মদনলাল, রবীন্দ্র সিং ও আমি, জীববিজ্ঞানী প্রভু মাতোন্দকর ও ডক্টর অলক ব্যানার্জি, সেখানে তাঁবু করে একমাস থাকব। বাকিরা হয়তো দু-একদিন কাটিয়ে যাবেন, তবে তাঁদের প্রধান কাজ হয় মূল শিবিরে নয়, জাহাজে থেকেই।

ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রায় দু-কোটি বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামে এক বিশাল মহাদেশের

অংশ ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই বিশাল মহাদেশ ভেঙে তৈরি হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টর্কটিকা ও ভারতবর্ষ। অ্যান্টার্কটিকার প্রাচীন যুগের পাথরের সঙ্গে গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অন্যান্য মহাদেশগুলির পাথরের খুবই সাদৃশ্য। অ্যান্টার্কটিকাতে পাওয়া গিয়েছে কয়লার স্তর এবং গ্লসপটেরিস পাতার ফসিল যার ফলে প্রমাণিত হয় সেখানে এককালে ছিল উষ্ণ নিরক্ষীয় আবহাওয়া।

আমরা শির্মাকার পাহাড়ের পঁয়ত্রিশ বর্গকিলোমিটার এলাকার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। একটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করা ছাড়াও নানান নমুনা সংগ্রহ করে এনেছি ভারতবর্ষে ফিরে গবেষণাগারে পরীক্ষা করার জন্য। আমরা সাধারণত সকাল নটায় কাজে বেরোতাম, ফিরতে রোজই রাত নটা হয়ে যেত। জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে সেখানে চব্বিশ ঘন্টাই দিনের আলো। ২৩ জানুয়ারি প্রথম রাত হলো আধঘন্টার জন্য। তারপর থেকে ধীরে ধীরে রাতের পরিধি বাড়তে লাগল। আমরা যখন মার্চ মাসে অ্যান্টার্কটিকা থেকে রওনা দিলাম তখন সেখানে ঘন্টাতিনেকের মতো রাত হতো।

প্রায় মাসখানেক বাদে শির্মাকার রেঞ্জের ফিল্ডওয়ার্ক সমাপ্ত করে আমরা ফিরে এলাম বেস ক্যাম্পে। সেখানে হিমবাহ গবেষণার কিছু কাজ করা হবে। তখন ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে গেছে। জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায়ই মাইনাস ২০ ডিগ্রি পর্যন্ত নামত। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেই সময় তুষার ঝড়ও অনেক বেশি হতে লাগল। জানুয়ারি মাসে ব্লিজার্ডের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই। ফেব্রুয়ারি মাসে তিন-চারদিন পর পরই প্রবল ব্লিজার্ড শুরু হয়ে যেত, আর সেই ঝড় চলত পাঁচ-ছয়দিন ধরে। তবে সৌভাগ্যের কথা, তখন আমাদের গবেষণাকেন্দ্রের বাইরের কাঠামো সম্পূর্ণ। ভিতরের কাজ ব্লিজার্ড হলেও চলতে থাকে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের স্থায়ী গবেষনাকেন্দ্র 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'র উদ্বোধন হলো। ভারতীয় পতাকার নিচে সব ধর্মের উপাসনা করার পর দলনেতা ডক্টর হর্ষ গুপ্তা শীতের অধিনায়ক কর্নেল সত্যস্বরূপ শর্মার হাতে বাড়ির ভার অর্পণ করলেন। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও জওয়ানদের অসীম অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায়ই এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পূর্ণ হলো মাত্র দু-মাসে। গর্বের কথা এই যে, এখন পর্যন্ত আর কোন দেশ মাত্র দু-মাসে অ্যান্টর্কটিকাতে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র সম্পূর্ণ করতে পারেনি। দোতলা এই বাড়িটি দু-ভাগে ভাগ করা । একদিকে আছে গবেষণাগার, সার্জারি ও মেডিক্যাল রুম, লাউঞ্জ, লন্ড্রি, রান্নাঘর, স্নো মেল্টিং প্ল্যান্ট ও বয়লার রুম। এইদিকের দোতলাতে আছে কমিউনিকেশন রুম, অফিস ঘর, ডার্করুম, শোবার ঘর, শাওয়ার এবং টয়লেট। অন্য ব্লকে আছে জেনারেটর রুম, নানাধরনের ওয়ার্কশপ, জ্বালানী রাখার এক বিশাল ট্যাঙ্ক এবং গ্যারাজ। তার দোতলায় আছে স্টোর। সারা বছরের রসদ সেখানে জমা করা আছে। সারা বছরের জ্বালানী তেল রাখা হয়েছে বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরের ফুয়েল ডাম্পে। সপ্তাহে একদিন সেখান থেকে ড্রাম এনে বাড়ির ট্যাঙ্কে ভর্তি করে রাখতে হবে। বাড়িটি সম্পূর্ণ তাপনিয়ন্ত্রিত। ভিতরের তাপমাত্রা আরামদায়ক পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া বাড়ির ঠিক মধ্যিখানে বসানো হয়েছে একটি গম্বুজ। এটির সাহায্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব। এখান থেকে পৃথিবীর যেকোন জায়গায় টেলিফোন করা যায়, টেলেক্স পাঠানো যায়।

উদ্বোধনের পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রবল তুষার-ঝড়। এবারের ঝড়ের দাপট সবচেয়ে বেশি; ঘন্টায় দুশো কিলোমিটার বেগে হাওয়া চলছে, তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দৃশ্যমানতা শূন্য; তবে এবারে আমরা আর তাঁবুর মধ্যে বন্দী নেই, আমরা সবাই উঠে এসেছি নতুন গবেষনাকেন্দ্রের নিরাপদ আশ্রয়ে। ইঞ্জিনিয়ারদের সুবিধেই হলো যে, ফেরবার আগে ঝড়ের মুখে বাড়ির খুঁটিনাটি ব্যবস্থা কেমনভাবে কাজ করে সে-সম্বন্ধে আন্দাজ পাওয়া গেল, যাতে দরকার মতো ডিজাইনের অদলবদল করা যায়।

আর কিছুদিন বাদেই বারোজন বাদে আমরা সবাই ফিরে আসব ভারতবর্ষে। শীতের দলের এই বারোজনকে এই বাড়িতে থেকেই কুমেরুর দীর্ঘ শীতের রাত্রির মোকাবিলা করতে হবে।

আসল ২৮ ফেব্রুয়ারী ততদিনে বাড়ির সামনে ঝড়ে উড়ে আসা বরফ জমে দোতলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একতলার

মূল দরজা দিয়ে বেরোনো অসম্ভব। আমরা দোতলার ইমার্জেন্সি দরজা দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখন ঝকঝকে সূর্যের আলো। আমাদের বরফে চলার গাড়ির প্রায় সবটাই ডুবে গেছে বরফে, বাড়ির চারপাশেও তখন একতলা সমান উঁচু বরফের রাশি। কুমেরুর বরফ একেবারে শক্ত জমাট বাঁধা। সেই বরফ পরিষ্কার করা। বিশেষ সহজ কাজ নয়। দুটো গাড়িকে উদ্ধার করতে লেগে গেল প্রায় চারঘন্টা। প্রায় বিকেল চারটায়। শীতের দলকে বিদায় দিয়ে আমরা বাকিরা ফিরে এলাম জাহাজে।

জাহাজ তখন মূল হিমসোপানে নোঙর করা। সামুদ্রিক বরফ সবই ভেঙে চলে গেছে। তবে আরো একটি শীত আসছে; তাই সমুদ্র আবার নতুন করে জমতে শুরু করেছে। সমুদ্র যাওয়ার আগেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে কুমেরু অঞ্চলের বাইরে।

১ মার্চ দুপুর তিনটেতে আমাদের যাত্রা হলো ঘরের দিকে। তার আগে শীতের দল এসেছিল আমাদের বিদায় জানাতে, তাদের আরেকটি বছর কাটাতে হবে এই হিমশীতল মহাদেশে। দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রিযাপনের পর আবার সূর্য উদয় হলে পরের গ্রীষ্মে চতুর্থ অভিযান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আসবে, তখন আবার নতুন দল থেকে যাবে তাঁদের জায়গায়। দক্ষিণের এই হিমভূমিতে স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে এইভাবেই চলবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা। বরফের পাড়ে দাঁড়ান কয়েকটি মানুষকে শুভকামনা জানিয়ে তাঁদের ও অ্যান্টার্কটিকাকে বিদায় জানালো বাকি সদস্যরা। ধীরে ধীরে ফিনপোলারিস এগিয়ে চলল উত্তরে। যাত্রা শেষ হলো গোয়ার মার্মাগাও বন্দরে ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ দুপুর বারোটায়।

তিনদিন পরে ফিরে এলাম কলকাতায়। আবার শুরু হয়ে গেল গতানুগতিক জীবন; তবে সঞ্চিত রইল অমূল্য কয়েকটি দিনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

□□□

অমৃত

রজনীকান্ত সেন

বিনয়

বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইল নগরে,
ছুটিল নগরবাসী জ্ঞান-লাভ করে;
সুন্দর-গম্ভীর-মূর্তি, শান্ত-দরশন,
হেরি' সবে ভক্তি ভরে বন্দিল চরণ।
সবে কহে, "শুনি, তুমি জ্ঞানী অতিশয়,
দু' একটি তত্ত্ব-কথা কহ মহাশয়।"
দার্শনিক বলে, "ভাই, কেন বল জ্ঞানী?
'কিছু যে জানি না', আমি এইমাত্র জানি।"

একতা

বর্ণমালা কহে, "দেখ, সীসের অক্ষরে,
আমাদের রেখে দেয় ভিন্ন ভিন্ন ঘরে।
শব্দের আকারে যবে মোদের সাজায়,
অর্থযুক্ত হই ব'লে শক্তি বেড়ে যায়;
বহু শব্দযোগে, ধরি বাক্যের আকার,
আরো বৃদ্ধি পায় শক্তি, সন্দেহ কি তার?
বাক্যে বাক্যে যোগ করি' সাজায় যখন,
গ্রন্থরূপে কত জ্ঞান করি বিতরণ।"

আধমধেম

রাখে না নিজের তরে, সব দান করে,
'উত্তম' বলিয়া তার খ্যাতি চরাচরে;
কিছু রাখে নিজ তরে, কিছু করে দান,
'মধ্যম' সে জন, তারো প্রচুর সম্মান;
দান নাহি, সে জন, সবে ঘৃণা করে তাকে।
নিজে নাহি ভোগ করে, না দেয় অপরে,
বল দেখি, সেই জীব কোন্ সংজ্ঞা ধরে?

হিংসার ফল

পাখিরা আকাশে উড়ে, দেখিয়া, হিংসায়,
পিপীলিকা, বিধাতার কাছে পাখা চায়;
বিধাতা দিলেন পাখা, দেখ তার ফল,—
আগুনে পুড়িয়া মরে পিপীলিকা-দল।
মানবের গীত শুনি', হিংসা উপজিল,
মশক, বিধির কাছে সুকণ্ঠ মাগিল;
গীত-শক্তি দিল বিধি; দেখ তার ফল,—
নর-করাঘাতে মরে মশক সকল।

ক্রোধ ও লোভ

ক্রোধ বলে, "লোভ ভাই, তুমি বড় খল,
তোমার কুহকে পড়ি' নিষ্ঠুরের দল,
পরের মাথায় করি' লগুড় প্রহার,
পলায়ন করে, সব লুঠে নিয়ে তার।"
লোভ কহে, "যা' বলিলে করি তা' স্বীকার,
কিন্তু, তুমি পূর্ণরূপে স্কন্ধে চাপ যার,
সে শুধু অন্যেরে মারি ক্ষান্ত নাহি হয়,
নিজের মাথায় শেষে প্রহরে নিশ্চয়।"

বেড়াল

জীবানন্দ দাশ

সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ায় গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়, যায়
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাঁকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

আলোকিত পথের দিশারী জননী রোকেয়া

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

"আপনারা শুনিয়া হয়তো আশ্চর্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে জীব ভারত-নারী। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই।... পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও ভূতারতে নাই।" (সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, চৈত্র ১৩৩৩) এই মর্মস্পর্শী উদ্ধৃতিটি আজ থেকে ৮৪ বৎসর পূর্বের। এই লেখাটি যাঁর লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে তাঁর নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হুসেন। যে যুগের এক মহীয়সী নারী, যিনি আজ প্রায় বিস্ম-তির অন্তরালে হারিয়ে যেতে বসেছেন। অবশ্য কিছু যুক্তিবাদী, মুক্ত বুদ্ধির বিবেকবান মানুষ, সম্প্রতি রোকেয়ার আসাধারণ ভূমিকার কথা, বিশেষ করে নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী পথিক হিসাবে তাঁর আপোষহীন প্রচেষ্টার কথা, বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে আবিষ্কার করে, লোকচক্ষুর গোচরে এনে হাজির করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ওপার বাংলায় রোকেয়া চর্চা শুরু হয় ১৯৭৩ সালে আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় রোকেয়া রচনাবলী প্রকাশিত হবার পর। ১৯৮৯ সালে এপার বাংলায় গৌরী আইয়ুবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে রোকেয়াকে স্মরণ করে — 'সুরাহা-সম্প্রীতি।' এরপর এগিয়ে এসেছে আরো কিছু সংস্থা ও কিছু আদর্শবাদী যুক্তিশীল মানুষ। এই প্রচেষ্টা আজ বিশ্বব্যাপী। ভারত, বাংলাদেশ, ফিজি এমন কি ইংলন্ড, জার্মানীতেও রোকেয়া চর্চা ক্রমশ প্রসারিত হতে দেখো যাচ্ছে। বিগত আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে রোকেয়ার অবদানেকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

যেমন 'মাদার' টেরেসা, যেমন 'ভগিনী' নিবেদিতা বলা হয় তেমনই রোকেয়াকে 'জননী' রোকেয়া বলে চিহ্নিত করার পরম্পরাও লক্ষ করা গেছে। রোকেয়ার দুই সন্তান শিশুকালেই মারা যায়। তার বদলে যেন সমগ্র মানব সন্তানকেই রোকেয়া আপন সন্তানের মত কোলে তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে সমাজে নিপীড়িত, অবহেলিত নারীদের তিনি প্রকৃত অর্থেই জননী স্বরূপা হয়ে উঠেছিলেন। সারা জীবন তিনি নারীর সম-মর্যাদার দাবিতে ও স্বাধীন সত্তার বিকাশের প্রশ্নে অতন্দ্র থেকেছেন।

রোকেয়া যখন জন্ম গ্রহণ করেন (১৮৮০) তখনও সমাজ মধ্যযুগীয় অন্ধকারের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি। বিশেষ করে নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারতবর্ষীয় সমাজ তখনও পিছিয়ে আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, ডিরোজিও, মাইকেল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার, বিথুন, বেন্টিঙ্ক প্রমুখ চিন্তাবিদ্ মনীষীরা, আধুনিক যুগের আলোর দিশারী হয়ে, প্রগতির পথে সমাজকে টেনে নিয়ে গেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে হিন্দু মেয়েরা শিক্ষার আলোক-প্রাপ্ত হয়ে, কিছুটা অগ্রসর হতে শুরু করেছেন। কিন্তু সেই আলোকিত বৃত্তের বাইরে এক বিরাট অংশ তখনও অনালোকিত রয়ে গেছে। নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে মুসলমান মেয়েদের অবস্থা আরো শোচনীয়। সেখানে তখন না ছিল শিক্ষার প্রচলন, না ছিল ন্যূনতম স্বাধীনতা। এক দুর্ভেদ্য অবরোধপ্রথার অন্ধকার কারাগারে অভিশপ্ত জীবন যাপনে তারা বাধ্য ছিল। এর থেকে মুক্তি পাওয়া আদৌ সম্ভব সেটুকু চিন্তা করার মত ক্ষমতাও তাদের লোপ পেয়েছিল। দীর্ঘকাল খাঁচায় বদ্ধ পাখি যেমন খাঁচার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে মুক্তির ইচ্ছাটুকুও হারিয়ে ফেলে, ঠিক তেমনি। রোকেয়া 'অবরোধ বাসিনী' (১৯৩১) গ্রন্থে অনেকগুলি মর্মান্তিক সত্য ঘটনার কথা লিখেছেন, যেগুলি পড়লে স্তম্ভিত হতে হয়। তাঁর লেখা অনেকগুলি ঘটনার মধ্য থেকে একটি উদ্ধৃত করা

যাক। "একটি বাড়িতে আগুন লাগিয়াছিল। বাড়ির গৃহিনী বুদ্ধিকরিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা হাতবাবাক্সে পুরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, ক্রমাগত পুরুষেরা আগুন নিভাইতেছেন। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নিচে গিয়া বসিলেন। তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না। ধন্য! কুল কামিনীর অবরোধ!" উপরোক্ত গ্রন্থে মোট সাতচল্লিশটি এই ধরনের ঘটনার (দুর্ঘটনা) বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অবরোধ প্রথার মর্মান্তিক যন্ত্রণা রোকেয়া নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞাতার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন। বাল্যকালে কেবল পুরুষের ক্ষেত্রেই নয়, বহিরাগত মহিলাদের থেকেও তাঁকে পর্দা করতে হতো। একবার এক মেম শিক্ষিকার কাছে তাঁর বাল্য শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু পর্দা নষ্ট হবে - এই যুক্তিতে তাঁর পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাড়িতে বাহিরাগত কেউ এলে শিশু রোকেয়াকে কি ভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হতো তার বিস্তৃত বিবরণ তাঁর লেখায় আছে। "আমি প্রাণ ভয়ে পলায়মান হরিণ শিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্রতত্র - কপাটের অন্তরালে কিম্বা টেবিলের নিচে পালাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটা নির্জন চিল-কোঠা ছিল; অতি প্রত্যুষে আমাকে কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত; প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম।... আমার খাওয়ার খোঁজ খবরও কেহ নিয়মিত লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিল-কোঠায় গিয়া উপস্থিত হইল ইহলে, তাহাকেই ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস পানি, কখনও খানিকটা বিন্নি (খই বিশেষ) আনিয়া দিত। কখনও বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না - ছেলে মানুষ ত, ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারিদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।" এই সব ভয়াবহ অভিজ্ঞতাগুলির কথা রোকেয়া সারাজীবন ভুলতে পারেনি, ভবিতব্য বলে মেনেও নেননি। এর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন।

পুরুষ বাবর আলি আনুমানিক ১৫৮৪ সাল নাগাদ অবিভক্ত বাংলার রংপুরের অন্তর্গত মিঠাপুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। রোকেয়ার পিতা আবু আলি সাবের সেই বংশের উত্তর পুরুষ। তাঁর চার স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী রাহাতুন্নেসার পাঁচ সন্তানের তিন কন্যার একজন রোকেয়া। পায়রাবন্দের বাড়িতেই ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়ার জন্ম। সেই যুগে মেয়েদের পড়াশোনা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। কোরান পড়ার মত বিদ্যা অর্জন করতে পারলেই হত। ফালসী ও উর্দু যদিও বা চলত, ইংরাজি ও বাংলা শিক্ষা ছিল নিষিদ্ধ। তাদের কাছে ইংরাজি বিদেশী বিধর্মীদের ভাষা ও বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তৎকালীন সচ্ছল মুসলমান পরিবারের লোকেরা মনে করতেন তাঁরা অভিজাত বা খানদানী মুসলমান, আরব বা পারস্য দেশ থেকে এসেছেন। বাংলা শিখলে প্রমাণ হবে তাঁরা ধর্মান্তরিত নিম্ন জাতির বংশোদ্ভূত দেশজ মুসলমান। রোকেয়ার মধ্যে শিশুকাল থেকেই কঠোর সংকল্পের আভাস, দেখা যায়। দিদির কাছে গোপনে বাংলা শেখেন আর গভীর রাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে দাদার কাছে ইংরাজি। পরে স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হুসেন তাঁকে উন্নত মানের উর্দু ও ইংরাজি শিখতে সাহায্য করেন। সাখাওয়াত ১৮৭৪ সালে হুগলি কলেজে ভর্তি হন এবং মেধাবী ছাত্ররূপে সবার প্রশংসা অর্জন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৮০ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ভূদেবের চেষ্টায় তিনি বিলাত যান ও কৃষিবিদ্যায় উচ্চ-শিক্ষা অর্জন করেন। ভাগলপুরে তিনি পদস্থাপিত হন। সেখানে বহুমূত্র রোগে ১৯০৯ সালের ৩ মে মারা যান। তিনি নারী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন এবং রোকেয়ার আগ্রহ দেখে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দশ হাজার টাকা দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া ভাগলপুরের খলিফাবাগে ১৯০৯ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু সাখাওয়াত পরিবারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রোকেয়া স্কুল গড়ার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হননি।

কলকাতায় ১৯১১ সালের ১১ মার্চ একটি ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে সাখাওয়াত মেমোরিয়ল নামে স্কুলটি আবার শুরু করেন।

নারীমুক্তির যে স্বপ্ন রোকেয়া সযত্নে লালন করেছেন, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য যে কোন উপায়ে তাঁর সাধের স্কুলটি বাঁচিয়ে তাকে আদর্শ স্কুল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রাণপাত করতেও দ্বিধা করেননি। এক একটি ছাত্রী সংগ্রহ করতে তাঁকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। নিজের খরচে স্কুল বাসের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। পথচারীরা যাতে ছাত্রীদের দেখতে না পায় তার জন্য তাঁকে অনেক বিচিত্র কৌশল উদ্‌ভাবন করতে হয়। বাস নিয়ে অভিভাবক ও নিন্দুকদের সমালোচনার বিষাক্ত কাঁটাগুলিকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে, পক্ষি-মাতা যেমন আপন পক্ষ-পুটে শাবককে রক্ষা করে, তিনি তেমনই তাঁর প্রিয় স্কুলটিকে রক্ষা করেছেন। তিনি জানতেন যে কোন উপায়ে নারী শিক্ষার মশালটিকে জ্বালিয়ে রাখতে পারলে নারীরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করবে, তাদের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি বিকশিত হবে, নারী স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সে যুগে কাজটা ছিল খুব কঠিন। একটু বেচাল হলে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির সলিল সমাধি হতে দেরি হবে না। তাই তাঁকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়েছে। তিনি নিজে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-মনস্ক, কুসংস্কারহীন হলেও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ওপর অন্ধ আঘাত করে মৌলবাদী শক্তিকে উস্‌কে দেননি। তাঁর বাস্তববাদী মন জানতো চারিদিকে প্রতিক্রিয়ার তলোয়ার উদ্যত রয়েছে, যে কোন মুহূর্তে মাথার উপর নেমে আসতে পারে চরম আঘাত। 'অবরোধ-বাসিনী'র কাহিনিগুলি যেন 'সুগার-কোটেড কুইনাইন'। এক একটি কাহিনী মর্মান্তিক। তবে সাহিত্য-রসে জারিত। সেরিনা জাহান ঠিকই বলেছেন -"সমাজ জীবনের অসংগতিগুলো তুলে ধরতে চেয়েছিলেন রোকেয়া।... রামকৃষ্ণ কথামৃতের মতো ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে অতি কঠোর সত্য, অতি গভীর উপলব্ধি অপরিহার্য উপদেশ সাবলীল দক্ষতায় রোকেয়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কঠোর ভাষায় সমালোচনা বা আক্রমণাত্মক ভাষা তিনি ব্যবহার করেননি। .... তিনি জানতেন, জন মানসে অকারণ আঘাত হেনে অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছতে পারবেন না।" সেরিনা জাহান রোকেয়ার রণ-কৌশল (ট্যাকটিক) সম্পর্কে যা বলেছেন তার সঙ্গে আমাদের মতের মিল আছে। তিনি বলেছেন — "রোকেয়ার গোটা জীবন খুঁটিয়ে দেখলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর স্কুল তৈরী, অঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম গড়ে তোলা বা তাঁর সাহিত্য - সৃষ্টি, সব কিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য সবসময় কাজ করেছে - স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এবং সেই শিক্ষাকে হাতিয়ার করে মেয়েদের 'সংসারের এক গুরুতর বোঝা' থেকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করা। আর তাঁর এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য তিনি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কোনো কুৎসা, অপবাদ, অভাব, বিপর্যয় তাঁকে টলাতে পারেনি। এমনকী, এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি আপসও করেছেন।" আমরাও মনে করি রোকেয়া আপস করে ভুল করেননি। বরং বাস্তবসম্মত কান্ড-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই কৌশলের জন্য তাঁর প্রিয় স্কুলটি অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। সেই স্কুল আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল বলে সর্বজন স্বীকৃতি পেয়েছে।

নারীর সর্বাত্মক আত্মবিকাশ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য রোকেয়ার কিছু পরামর্শ সে যুগের পটভূমিকায় বৈপ্লবিক বলেই বিবেচিত হবে। যেমন তিনি বলেছেন — "শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতার আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত। এক ধান ভানা ও যাঁতা চালনায় দেশের সর্ববৃহৎ খাদ্য সমস্যা পূরণ হইবে। অধুনা ঢেঁকিছাটা চাউল ও যাঁতায় পেষা আটার অভাবে দেশের লোক মৃত্যু স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। শুধু লম্ফ-ঝম্ফ ইত্যাদি অপেক্ষা উপরোক্ত রূপ শরীর চর্চা শতগুণ শ্রেয়। খোলা মাঠে প্রাতঃভ্রমণও অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। গবর্ণমেন্ট এখন শিশুরক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন, ভাল কথা, কিন্তু প্রথমে শিশুর মাতাকে রক্ষা করা

চাই।" দেখা যাচ্ছে রোকেয়ার চিন্তা-ভাবনা আকাশচারী ছিলনা, গভীর বাস্তব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল শিকড় সন্ধানী ছিল।

নারীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা ও পন্থা নিরুপণের পরে রোকেয়া সেখানেই থেমে থাকেননি। সর্ব ক্ষেত্রে পুরুষর সমকক্ষতা দাবি করার পর তিনি চেয়েছেন ভারতীয় নারীর জাগ্রত চেতনা ভারতবর্ষের নির্মাণে সহায়ক হোক। সুগৃহিনী প্রবন্ধে নারীদের জাতিগত কূপ মন্ডুকতা পরিহার করে নিবিড়, উদার সৃষ্টিশীল ভারতীয়ত্ব অর্জনের জন্য আহ্বান করেছেন- "আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসী খ্রীষ্টিয়ান অথবা বাঙালি, মাদ্রাসী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি — আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী—তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন।" 'মুক্তিফল ও 'জ্ঞানফল' রূপকধর্মী গল্প দুটিতে রোকেয়া বলতে চেয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে মেয়েরাও যতদিন না যোগ দিচ্ছে, ততদিন সে সংগ্রাম সফল হবে না। এরপর মেয়েদের জন্য ভোটাধিকারের দাবি জানিয়ে তিনি আরো দূরদর্শিতার পরিচয় দেন।

জীবনে কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ না পেলেও রোকেয়া সারাজীবন নিজ চেষ্টায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ ও অভিভাষণগুলি পর্যালোচনা করলে জানা যায় রসায়ণ শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, শরীর বিদ্যা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ইসলামী শরিয়া আইন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কত গভীর ও ব্যাপক ছিল।

রোকেয়ার যাবতীয় লেখা উদ্দেশ্যমূলক। সখের সাহিত্য সৃষ্টি নয়। তবু তাঁর লেখাগুলি যথেষ্ট সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন। এমন সাবলীল, ঋজু ভাষা-প্রয়োগ, এমন তীক্ষ্ণ যুক্তিজাল বিস্তার, নিপুণ শিল্পিত যথাযথ শব্দের ব্যবহার, বিষয়কে ব্যঞ্জনাময় সরসভঙ্গীতে উপস্থাপন করার অনায়াস দক্ষতা সেই যুগে খুব কম মহিলা সাহিত্যিকের অধিগত ছিল।

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর ভোরবেলায় তাঁর কর্মময়, বর্ণময়, সংগ্রামী জীবনের চির অবসান হয়।

□□□

জেনে রাখো

ভান্ডার	—	ভাঁড়ার, ধন বা অন্য জিনিস রাখবার ঘর।
রতন	—	রত্ন, মণিমুক্তা ইত্যাদি (রতন কবিতার ভাষা, মূল শব্দ রত্ন)
অবহেলা	—	অনাদর, অযত্ন
আচরি	—	আচরণ করে (কবিতার ভাষা)
পরিহরি	—	ত্যাগ করে (কবিতার ভাষা)
সঁপি	—	সমর্পণ করে (কবিতার ভাষা)
মজিনু	—	মগ্ন হওয়া, মুগ্ধ হওয়া
তপ	—	তপস্যা
অবরেণ্য	—	যাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা যায় না (বরেণ্য — যাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা যায়।)
কেলিনু	—	খেলা করি (কবিতার ভাষা)
শৈবাল	—	শ্যাওলা
কুললক্ষ্মী	—	বংশের প্রতিষ্ঠিতা দেবী লক্ষ্মী
মাতৃকোষে	—	কোষ-ধন রাখার জায়গা। — জন্মভূমিকে মা বলা হয়। সেই মায়ের কোষাগার, এখানে ধন অর্থে বাংলা ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। জননী বঙ্গভূমির কোষাগারে বঙ্গভাষা রূপ ধন রয়েছে।
নামধাতু	—	নাম বা শব্দকে অনেক সময় ধাতু বা ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একে নামধাতু বলা হয়। যেমন, 'প্রবেশিলা' — প্রবেশ একটি শব্দ, তাকে ক্রিয়া রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবেশিলা অর্থ প্রবেশ করলো। কবি মধুসূদন তাঁর কাব্যে এইরকম নামধাতুর সার্থক প্রয়োগ করেছেন। 'বঙ্গভাষা' কবিতার 'আচরি', 'পরিহরি' প্রভৃতি এই ধরনের শব্দ।

চর্তুদশপদী কবিতা —

'বঙ্গভাষা' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি চর্তুদশপদী কবিতা। আট ছয় মাত্রায় চোদ্দটি লাইনে এই কবিতা লেখা হয়। এখানে একটি বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এ সম্পর্কে তোমরা পরে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে।

কবি পরিচিতি —

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) জন্মস্থান যশোর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে। হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করেন। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ছাত্র জীবনেই লেখা লেখি শুরু করেন এবং তৎকালীন বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। নারী শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তখন থেকেই ইংরাজী সাহিত্যের মুগ্ধ পাঠক মধুসূদন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন ঐ সাহিত্যের অগ্রগণ্য কবি হবার। — পিতা তাঁর বিবাহের অয়োজন করলে, মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তা ব্যর্থ করে দেন। তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন। কলকাতা থেকে মাদ্রাজে যান ও সেখানে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। সে সময়েই Captive Lady ও Visions of the Past গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কলকাতায় ফিরে এসে বিখ্যাত হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসে শমিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ প্রভৃতি সাড়া জাগানো নাটক ও প্রহসন লেখেন। পরে হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে ইংরাজী সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা ছেড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। মাইকেল মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য, বীরাঙ্গনাকাব্য, মেঘনাদবধকাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন দখল করেছেন। ১৮৬২ সালে তিনি ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলাত যান। প্রবাসে থাকার সময়ে চতুর্দশপদী কবিতা অর্থাৎ বাংলায় সনেট রচনা করে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে বিদেশী ভাষার মোহে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকার পর তাঁর মোহভঙ্গ হয়। এজন্য তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে কয়েকটি কবিতাও লেখেন।

কাব্য পরিচয় —

'বঙ্গভাষা' কবিতায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলনা করা হয়েছে রত্নের ভান্ডারের সঙ্গে। রত্নরাশি যেমন মূল্যবান, তেমনি দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিও অমূল্যধন। কিন্তু কবি মধুসূদন চেয়েছিলেন, ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি লাভ করতে। অবশ্য পরে সে ভুল তাঁর ভেঙ্গে গিয়েছিল। কবি তাঁর মাতৃভাষার জগতে ফিরে আসেন। কালক্রমে সেখানেই তিনি মূল্যবান রত্নভান্ডারের সন্ধান পান। অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি মধুসূদন বঙ্গভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হন।

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটিতে (✓) চিহ্ন দাও।

1. হে বঙ্গ .....তব বিবিধ রতন। (ভান্ডারে / আগারে)
2. পরধন লোভে মত্ত করিনু .....। (ভ্রমণ / দর্শন ।)
3. কাটাইনু বহুদিন.....পরিহরি । (সুখ / দুঃখ)
4. কেলিনু শৈবালে ভুলি.....কানন। (কমল / গোলাপ)
5. পালিলাম.....সুখে, পাইলামকালে । (আজ্ঞা / অবজ্ঞা)
6. .....ভাষা রূপে খনি, পূর্ণ মনিজালে। (মাতৃ / বঙ্গ)

অতি সংক্ষেপে লেখো

7. কবি কাকে অবহেলা করেছিলেন ?
8. কবি মধুসূদন কোন ভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করতে চেয়েছিলেন ?
9. 'মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি' — কোন অবরেণ্য কে কবি বরণ করতে চেয়েছিলেন ?
10. মাতৃভাষাকে শেষপর্যন্ত কবির কী মনে হয়েছিল ?

সংক্ষেপে লেখো

11. কবি নিজেকে অবোধ বলেছেন কেন ?
12. কী কারণে কবি পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি করতে গিয়েছিলেন ?
13. কুললক্ষ্মী কবিকে স্বপ্নে কী বলেছিলেন ?
14. কেমনভাবে কবি মধুসূদন কুললক্ষ্মীর আদেশ পালন করেছিলেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

15. ইংরাজী ভাষার কাব্যরচনাকে কবি কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন ? নিজের কথায় বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে লেখো।
16. নিজের মাতৃভাষা বাংলাভাষাকে অবহেলা করে কবি আক্ষেপ করেছেন কেন ? এই ভাষা সম্পর্কে কবির অনুভূতির কথা নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লিখে সেগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো

অনিদ্রা	অবরেণ্য
অজ্ঞান	অনাহার
অবোধ	পরদেশ
সুখ	পূর্ণ

2. পদ পরিবর্তন করো

অবহেলা	ভিক্ষা
মন	কুল
কায়	লোভ

3. নিচের শব্দগুলিকে আলাদা করে লেখো

পরদেশ	মাতৃকোষ
ভিক্ষাবৃত্তি	মণিজাল
কুললক্ষ্মী	কমল-কানন

4. নিচে দেওয়া শব্দগুলির ব্যাসবাক্য ও সমাস লেখো

অনিদ্রা	পরধন
মাতৃভাষা	কুক্ষণ
নিরাহার	

5. তোমার নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

করতে পারো —

কবি মধুসূদনের লেখা বেশ কিছু কবিতা আছে ছোটদের জন্য। সেগুলি তোমরা পড়ে দেখতে পারো। নিজের মাতৃভাষা বাংলাভাষায় লেখা অসংখ্য সুন্দর সুন্দর গল্প কবিতা রয়েছে — সেগুলি পড়ো এবং জানো। বাংলাভাষায় লেখার অভ্যাস করো।

অর্থ বুঝে নাও

পর ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় নিরাহারে সঁপি কায় মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল কানন।

পরধন অর্থ এখানে বিদেশী ভাষা। যা আমার নিজের ভাষা নয়, তাই পরধন। ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে কবি খ্যাতি লাভ করতে দেয়েছিলেন। তারই জন্য নিজের দেশ, নিজের ভাষার মতো সমৃদ্ধশালী ভাষা ছেড়ে দীর্ঘকাল বৃথাই বিদেশে থেকে সময় নষ্ট করেছেন। নিদারুণ অর্থকষ্ট এবং মানসিক শান্তির অভাবে কবি সেখানে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি অবরেণ্য (যা বরণ অথবা স্তুতির যোগ্য নয়) বলেছেন বিদেশী ভাষাকে। বাংলাভাষা কমল কাননের সুগন্ধি পদ্ম ফুল আর ইংরাজী ভাষা শৈবাল বা শেওলায় ভরা জলাশয়। কবি বঙ্গভাষারূপ কমল কাননকে ভুলে বিদেশী ভাষার শৈবালের মধ্যে মগ্ন থেকেছেন। এখানে এই কারণেই তিনি আক্ষেপ করেছেন। কমল অর্থাৎ পদ্ম ফুল দেবী দুর্গার পূজায় লাগে, তাই তা স্বতঃই পবিত্র, আর শৈবাল বা শেওলা জলাশয়কে দুষিত করে তোলে।

নদী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে।
শোন্ চলচল্ ছলছল
সদাই গাহিয়া চলেছে জল
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে
ওরা কার কোলে বসে দুলে।
সদা হেসে করে লুটোপুটি,
ওরা সকলের মন তুষি
আছে আপনার মনে খুশি।

আমি বসে বসে তাই ভাবি,
নদী কোথা হতে এল নাবি।
কোথায় পাহাড় সে কোনখানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে।
কেহ যেতে পারে তার কাছে,
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে।
সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি পশুপাখিদের বাস,
সেথা শবদ কিছু না শুনি,
পাহাড় বসে আছে মহামুনি

তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধুধু।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মতো।
শুধু হিমের মতন হাওয়া,

সেথায় করে সদা আসা যাওয়া,
শুধু সারা রাত তারাগুলি
তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি।
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তারে মুকুট পরায় হেসে।

সেই নীল আকাশের পায়ে,
সেথা কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপন-সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে,
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা।
সেথায় একা ছিল দিনরাতি
কেহই ছিল না খেলার সাথী।
সেথায় কথা নাহি কারো ঘরে,
সেথায় গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরু ঝুরু ঝিবি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে।

(সংক্ষেপিত)

জেনে রাখো

দিবস	—	দিন
রজনী	—	রাত্রি
তুষি	—	তুষ্ট করি, খুশি করি (কবিতার ভাষা)
তরু	—	গাছ
শবদ	—	শব্দ (কবিতার ভাষা)
হিম	—	তুষার, খুব ঠান্ডা
আঁখি	—	চোখ
একদা	—	একদিন
ভবে	—	পৃথিবীতে

কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও বিশ্বখ্যাত কবি। প্রথাসিদ্ধ বিদ্যালয়ের শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেননি। ঠাকুর বাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার আবহে বাল্যকাল অতি বাহিত হয়। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য তিনি বিলাত যান। দেড় বছর পরে পিতার নির্দেশে দেশে ফিরে আসেন। প্রথম ছাপা কবিতা হিন্দু মেলার উপহার (১২৮১)। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে বনফুল, কবি কাহিনী, ভানু সিংহের পদাবলী, শৈশব সংগীত, রুদ্রচন্ড প্রকাশিত হয়। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ভারতী (১৮৭৭) ও বালক (১৮৮৫) পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। প্রথম ছোটগল্প ভিখারিনী ও প্রথম উপন্যাস করুণা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যা সংগীত প্রকাশের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জন করেন। বোলপুরে প্রথমে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করেন (১৯০১)। পরে সেটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯১৩ সালে ইংরাজি গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য এশিয়ায় প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। কবি বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে নানা দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয়, সাহিত্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত, নৃত্যনাট্য রচনা করে বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধকরেছেন। সংগীতে নতুন রীতির সূর সংযোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাট্যম, নামে তিনি নিজস্ব মৌলিক এবং ধ্রুপদী নৃত্যশৈলী সৃষ্টি করেন। তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষা দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্বভারতীয় শিক্ষাদর্শের মাধ্যমে, পল্লী উন্নয়ন, সমবায় আন্দোলন, বৈজ্ঞানিক প্রথার কৃষিকার্যে উৎসাহ দান ইত্যাদিতে তিনি যুক্ত ছিলেন। সমাজ সংস্কার মূলক ও জন কল্যাণকর কর্মকান্ডের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা । শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।

কাব্য পরিচয়

কবি বয়ে চলা নদীকে দেখে জগৎবাসীকে সম্বোধন করে বলেছেন, তারা কি জানে কার কোলে বসে নদী ছলছল সংগীতের ধ্বনির সঙ্গে ঢেউ এর তালে সারারাত সারাদিন নেচে চলেছে? তার এই আনন্দধারা যেন সবার মনে খুশির ঢেউ তুলেছে।

কবির মনে প্রশ্ন জাগে কোন পাহাড় হতে এই পৃথিবীর কোলে নদীর আবির্ভাব? সেই পাহাড়ের নাম, সেখানকার প্রকৃতি কবির কাছে অজানা, হয়ত সেখানে মানুষ, পশুপাখি, সবুজের সমারোহ কিছুই নেই। তপস্যারত মহামুনির মতো সেই পাহাড়ও যেন ধ্যানমগ্ন।

ধ্যানমগ্ন এই পাহাড়ের মাথা সাদা বরফে ঢাকা, সেখানে মেঘেরা যেন ঘরের ছেলের মতন পাহাড়কে ঘিরে আছে, শুধু হিমেল হাওয়ার আসা যাওয়া, রাতের তারাদের চেয়ে থাকা। আর ভোরের সোনা রং এর সূর্যের কিরণের ছটা বরফের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। এই ছটা পাহাড়ের মাথায় সোনার মুকুটের রূপ ধারণ করেছে।

নীল আকাশের গায়ে বরফসোনার মুকুট পড়া পাহাড়ের বুকে নদী ঘুমিয়ে থাকে, রোদের উষ্ণ পরশ পেয়ে নদীর ঘুম ভাঙ্গে। শান্ত, নীরব পরিবেশে খেলা নেই, গান নেই, কথা নেই তাই এই পৃথিবীকে দেখে নিতে সুরে, তালে, ছন্দে ধীরে ধীরে বরফের কোল ছেড়ে নদী নেমে এলো।

পাঠ বোধ

1. কবিতায় অনেক সময় একটা শব্দ দুবার পরপর ব্যবহার করা হয়। ছন্দের খাতিরে অথবা শুনতে ভালো লাগে বলে। যেমন 'নদী' কবিতাটিতে চলচল্, ছলছল্।

   এই রকম আরও কয়েকটি শব্দ তোমার এই পাঠ ('নদী') থেকে খুঁজে বার করে লেখো।

অতি সংক্ষেপে লেখো

2. ঢেউ কোথায় ওঠে?
3. কোথায় শব্দ শোনা যায় চলচল্ ছলছল্?
4. দিবস রজনী কারা নাচে?
5. মহামুনির মতো কে বসে আছে?

সংক্ষেপে লেখো

6. "ওরা সকলের মন তুষি
   আছে আপনার মনে খুশি" — এখানে 'ওরা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
7. নদী কোথা থেকে নেমে এলো?
8. কোন জায়গায় ঘাস অথবা পশুপাখি নেই?
9. কার মাথার উপরে সাদা বরফ ধুধু করছে? মেঘেরা সেখানে কেমন ভাবে থাকে?

বিস্তারিতভাবে লেখো

10. "কোথায় পাহাড় সে কোনখানে,
    তাহার নাম কি কেহই জানে।" — নাম না জানা এই পাহাড়ের যে সুন্দর বর্ণনা কবি দিয়েছেন,তা নিজের ভাষা লেখো।
11. 'নদী' কবিতায় ছবির মতো অপূর্ব যে নদীর পরিচয় কবি করিয়েছেন আমাদের সঙ্গে, তার কথা নিজের মতো করে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিজের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লিখে সেগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো —

   দিবস

   কোমল

   সাদা

   রাত

   খুশি

   মানুষ

2. সাধু ভাষায় লেখা শব্দগুলিকে চলিত ভাষায় বদল করে লেখো —

গাহিয়া	ভাবিল
তাহার	দেখিয়া
করিছে	উঠিল

3. কবিতার শব্দগুলিকে সাধারণ ভাবে লেখো —

স্বপন

দিন রাতি

বাহিরিল

শবদ

তুষি

4. নিচের শব্দগুলির ব্যাসবাক্য ও সমাস লেখো —

মহামুনি	দিবস রজনী
পশুপাখি	স্বপন-সুখ
সূর্যকিরণ	কুসুম কোমল

একটি মাণিক

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

পড়ার আগে ভাবো

মাণিক তুল্য একমাত্র সন্তানের প্রতি মায়ের সদা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে। হারাবার ভয় তার মনকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। মানুষ মায়ের মত প্রকৃতিতে সব মায়েরই হৃদয় জুড়ে সন্তানের প্রতি দুর্বলতা থাকে। গাছ মায়েরও সন্তান হারানোর বেদনা কি কেউ অনুভব করেছো?

শীতের শেষে বটের মাথে একটি পাতা রয়,
ছুটে এসে প্রবল হাওয়া তার উপরে বয়।

বট সে বলে — সকল ছেলে হারিয়ে রয়েছি;
একটি মাণিক দুলছে বুকে, সেটিও নেবে কি?

কোনই কথা কয়না হাওয়া, কেবল হানাহানি,
বটের' পরে পাতার শিরে পড়্লো টানাটানি।

বট সে বলে, 'মাটির থেকে যা কিছু রস পাই -
একটি আমার ঐ মাণিকে দিচ্ছি যে সবটাই'।

হাওয়ার কেবল বিপুল তাড়া, হানার পরে হানা;
কাতর পাতা শিউরে নুয়ে করছে কত মানা।

এমনি আসে দিনে রাতে পাগল হাওয়া মাতি,'—
সইল না আর, খসল পাতা ধূলায় করে সাথী।

আজকে আমি বটের পানে কেবল চেয়ে দেখি—
শেষ মাণিকে হারিয়ে সে যে উদাস, আহা একি!

জেনে রাখো

মাণিক	—	মাণিক্য, অমূল্য রত্ন, স্নেহের পাত্রকে আদরের সম্বোধন।
মাথে	—	মাথায় (কবিতায় ছন্দের জন্য মাথে হয়েছে)
রয়	—	আছে
কয়না	—	কহেনা, বলে না
শিরে	—	মাথায়
বিপুল	—	খুব
নুয়ে	—	ঝুঁকিয়ে

কবি পরিচিতি

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৪৭) জন্ম হুগলী জেলার গোপীনাথপুর গ্রামে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজীতে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক পান। অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারী অফিসের চাকরি ছেড়ে দেন। তাঁর স্বদেশী ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধগুলিতে। তিনি প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮ সালে বঙ্গবাসী কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি সুভাষবাদী ছিলেন। মাসিক উদয়ন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তার লেখা গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অরুনিমা, কোজাগরী, জয় সুভাষ ইত্যাদি। অনুবাদ সাহিত্যেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য, যেমন মেঘদূত, দেবযানী, পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত প্রমুখ। ছোটদের জন্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ছড়া ও ছোটদের জন্য লেখা হালুম বুড়ো, ভুতের লড়াই, মজার পদ্য, বেড়ালের ছড়া ও কিশোরদের জন্য লেখা বাংলা দেশের কবি, অদ্ভুত জীব জন্তু, ভুতে রাক্ষসে, শালিখের গঙ্গা যাত্রা, একসময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর লেখা 'ভীষ্ম' নামে ইংরাজী গ্রন্থ এক সময়ে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা স্তরে পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত হয়।

কাব্য পরিচয়

শীতের শেষে বটগাছের সব পাতা ঝরে গেছে কেবল একটি পাতা গাছের মাথায় রয়ে গেছে। প্রচন্ড হাওয়ায় পাতা দুলে উঠেছে। গাছ তার শেষ একমাত্র সন্তান পাতাটিকে রক্ষা করবার জন্য হাওয়াকে কাতরভাবে অনুরোধ করে, সে তার সব ছেলেকে হারিয়েছে, একটি মাত্র ছেলে আছে, তাকে যেন মায়ের বুক থেকে কেড়ে না নেয়। গাছ মাটি থেকে যেটুকু রস গ্রহণ করে তার সবটুকু সবে ধন একটি রত্ন পাতাটিকে দেয়। কিন্তু হাওয়া তার কোন কথাই শুনলো না। পাতা ঝরে পড়ল ধূলায়। গাছের দিকে তাকিয়ে কবির মন দুঃখে ভরে উঠেছে। তাঁর মনে হয়েছে গাছ যেন শেষ সন্তানকে হারিয়ে শোকে উদাস হয়ে চেয়ে আছে।

দুটি কথা

পাতা গাছের সন্তান নয় কিন্তু কবির কল্পনায় 'একটি মাণিক' কবিতাটিতে সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠ বোধ

1. ঠিক শব্দটি বেছে ঠিক জায়গায় বসাও

   ..... শেষে বটের মাথে..... পাতা রয়,'

   বর্ষার / শীতের, একটি / দুটি

সংক্ষেপে লেখো

2. 'সকল ছেলে হারিয়ে রয়েছি' কথাটি কে কাকে বলেছে? 'সকল ছেলে' কারা?

3. একটি মাণিক কে?

4. 'হানার পরে হানা' কে দিচ্ছে? কাকে দিচ্ছে?

বিস্তারিতভাবে লেখো

5. কবি কবিতাটির নাম একটি মাণিক কেন দিয়েছেন? তুমি নিজের মতো করে বুঝিয়ে লেখো।

6. "আজকে আমি বটের পানে কেবল চেয়ে দেখি—
শেষ মাণিকে হারিয়ে সে যে উদাস, আহা একি!"
উপরের অংশটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? 'আমি' কে? তাঁর নাম লেখো।
লাইনদুটি পড়ে কী বুঝলে? নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

শীত	মাথায়	দিচ্ছি
শেষ	উপরে	দিনে

2. নিচে দ্বিত্ব শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো

হানাহানি	বলাবলি	কানাকানি
টানাটানি	জানাজানি	চোখাচোখি

3. তোমার চোখে শীতকালে প্রকৃতির রূপ কেমন হয়? এ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

জানো কী

1. কোন্ দুটি মাস শীতকাল?

2. শীতের শেষে কোন্ ঋতু আসে? নাম লেখো।

আমার বাড়ি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পড়ার আগে ভাবো

প্রকৃতির সুন্দর রূপ কে না ভালবাসে আর তার মাঝে যদি নিজের একটি ছোট্ট বাড়ি থাকে তা সে যতই ছোট হোক, সেখানে বাস করার আনন্দই আলাদা। তোমাদের কী মনে হয়?

বাড়ি আমার ভাঙ্গন ধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।
সামনে ধূসর বেলা জলচরের মেলা
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে।

ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ,
আমি দেখি আপন মনে, আর দেখে না কেউ।
জেলেরা দেয় বাচ লাফায় বোয়াল মাছ,
নীরব আকাশ মুখর করে শঙ্খচিলের ডাকে।

ভাঙ্গা বাড়ির ভাঙ্গা ঘাটে আছড়ে পড়ে জল,
মেঠো ফুলের মিঠা বাসে মন করে চঞ্চল।
যতই দূরই চাই, শোভার সীমা নাই,
পল্লীবধূ কলসি ভরে জল লয়ে যায় কাঁখে।

মাধবী যুঁই মালতীতে ঘেরা উঠান মোর
আমের গাছে কোকিল ডাকে দিবস নিশি ভোর।
দোয়েল পাপিয়ায় গানে কানন ছায়
চক্র রচে মৌমাছিরা নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে।

জেনে রাখো

ভাঙ্গন ধরা	—	ভেঙ্গে যাওয়া
বাঁকে	—	নদী যেখানে মোড় নেয়।
সোহাগে	—	আদর ।
স্থল	—	ডাঙ্গা, ভূমি, স্থান ।
ধূসর	—	ছাই রং।
জলচর	—	যেসব প্রাণী, জলে থাকে বা চরে বেড়ায়।,
সুদূর	—	অনেক দূর
তরুলতা	—	ছোট ছোট লতানো গাছ।
জেলে	—	যারা মাছ ধরে জীবন-যাপন করে।
বাচ	—	নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা (বাইচ শব্দটি থেকে বাচ হয়েছে।)
নীরব	—	নিঃশব্দ, কথা নেই।
মেঠো	—	মাঠ বিষয়ক
মুখর	—	খুব কথা বলা, বাচাল
শঙ্খচিল	—	যে চিলের গলায় সাদা ও লালচে রংএর দাগ থাকে। (জেনে রেখো, গাঙচিলও আছে। যে চিল নদীর ওপর উড়ে বেড়ায়)
বাস	—	সুগন্ধ (ভিন্ন অর্থে—বাস—বস্ত্র, কাপড়; বাস—বাসস্থান)
শোভা	—	সৌন্দর্য।
পল্লীবধূ	—	গ্রামের বৌ
কাঁখে	—	বগলে
দিবস	—	দিন
নিশি	—	রাত
কানন	—	বন, বাগান
চক্র	—	চাকা, চাকার মতো গোল আকার বিশিষ্ট
রচে	—	রচনা করে, তৈরি করে (কবিতার ভাষায় 'রচে' হয়েছে)
চক্র রচে মৌমাছিরা	—	মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করে।
নিত্য	—	রোজ, প্রত্যহ

কবি পরিচিতি

কুমুদ রঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০) আজীবন শিক্ষকতা করেছেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে কবিত্ব শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছে। অজয় নদীর তীরে ছিল তাঁর গ্রাম। সেখানে বসে যে কবিতা তিনি রচনা করেছেন তাতে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ, প্রকৃতি প্রেম, ও গ্রাম জীবনের সহজ সরল ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, "কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাঙলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গল শঙ্খের কথা মনে পড়ে।" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কবি প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ বিখ্যাত জগত্তারিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করে। বাংলা দেশের কবি সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্য তীর্থের' তীর্থপতি ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে উজানী, একতারা, বনতুলসী, রজনীগন্ধা প্রমুখ। গ্রন্থের সংখ্যা চোদ্দ।

কাব্য পরিচয়

দুই পাড় ভেঙ্গে চলা অজয় নদীর তীরে প্রকৃতির আদরে ঘিরে থাকা একটুকরো স্থলভূমিতে কবির বাড়ি। বেলা পড়ে আসা দুপুরে নদীর জলে জলচর পাখিদের ভেসে বেড়ানো, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা দূরের ছোট গ্রাম, জেলেদের নৌকা

প্রতিযোগিতায় মাছেদের মধ্যে চঞ্চলতা, শঙ্খচিলের ডাকে মুখর হয়ে ওঠা শান্ত আকাশ, মেঠো ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরা বাতাস, তারই মধ্যে দিয়ে কলসি নিয়ে চলে গ্রামের বধূ। যুঁই, মালতীর মাঝে মৌমাছিদের চাক, আমের ডালে সকাল সন্ধ্যে কোয়েল, দোয়েল পাপিয়ার গানে কবির আঙিনা ভরে উঠেছে।

পাঠ বোধ

ঠিক উত্তরটি বেছে খালি জায়গায় বসাও

1. বাড়ি আমার ভাঙ্গন ধরা ..... নদীর বাঁকে । (গঙ্গা / অজয়)
2. সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় ..... ফাঁকে । (বনলতার / তরুলতার)
3. ঠিক ..... বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ। (দুপুরে / সকালে)
4. লাফায় ..... মাছ। (ইলিশ / বোয়াল)
5. .....গাছে কোকিল ডাকে দিবস নিশি ভোর । (জামের / আমের)

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. কোন নদীতে ভাঙ্গন ধরে ?
7. জলের ঢেউ কেন নাচে ?
8. কার ডাকে আকাশ মুখর হয় ?
9. পল্লীবধূ কোন নদীর জল নিয়ে যায় ?
10. কোন কোন ফুলগাছে ঘেরা কবির বাড়ির উঠান ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

11. জলচর কাকে বলে ?
12. বোয়াল মাছ কেন লাফায় ?
13. শঙ্খচিল কেমন দেখতে ?
14. জল কোথায় আছড়ে পড়ে ?
15. কবির মন কেন চঞ্চল হয় ?
16. 'চক্র রচে মৌমাছিরা' বলতে তুমি কী বোঝ ? লেখো

বিস্তারিতভাবে লেখো

17. কবির বাড়িটি কোথায় ? তার আশে-পাশে যে দৃশ্যের বর্ণনা আছে তা তুমি 'আমার বাড়ি' কবিতাটি অবলম্বনে কবির নাম উল্লেখ করে লেখো।
18. তুমি যেখানে থাকো সেই বাড়ি শহরেই হোক বা গ্রামেই হোক তার চার-পাশের প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা তুমি তোমার নিজের মতো করে লেখো।

19. নিচে কয়েকটি ফুলের নাম দেওয়া আছে এরমধ্যে যে যে ফুল লতানো ফুলের গাছে হয় সেগুলি সেই ফুলের পাশে লেখো।

জবা —

করবী —

অপরাজিতা —

গাঁদা —

মালতী —

কলকে —

যুঁই —

নয়নতারা —

মাধবী —

রংগন —

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিশেষ্য পদগুলি বিশেষণে বদলাও

মুখর	মাঠ	আকাশ
ধূসর	গ্রাম	জল

2. বিপরীত শব্দ লেখো

স্থল	নীরব	সামনে
দূর	নিশি	চঞ্চল

3. এককথায় লেখো

জলে চরে যে

আকাশে উড়ে যে

গ্রামে থাকে যে

শহরে থাকে যে